গ্লকোমার সাথে বসবাস

অধ্যাপক ডা. এম. নজরুল ইসলাম

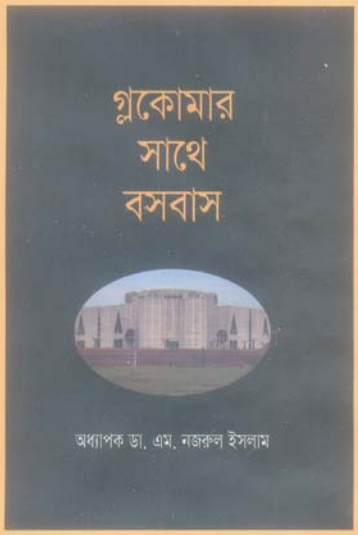

চোখের নানা সমস্যার কথা জানার আগ্রহ আমাদের অনেকেরই।

গ্লকোমা বলতে কি বোঝায়? গ্লকোমা রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা, জন্মগত গ্লকোমা, প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমা, প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লকোমা, অকুলার হাইপারটেনশন, লো টেনশন গ্লকোমা, উপসর্গহীন চোখে গ্লকোমা, পানি চা কফি ও গ্লকোমা, পড়াশুনা সেলাই টিভি ও গ্লকোমা, গ্লকোমা রোগীর জন্য ক্ষতিকর ওষুধ, গ্লকোমা ও চোখের ছানি, গ্লকোমা রোগী ও সমাজের প্রতি তার কর্তব্য, গ্লকোমা প্রতিরোধ এবং সর্বোপরি গ্লকোমা নিয়েই কিভাবে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করা যায় ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই বইটিতে।

গ্লকোমা রোগী যাতে এই রোগটিকে সহজভাবে সম্যক উপলব্ধি করে এর চিকিৎসার গুরুত্ব বুঝতে পারেন সেদিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বইটিতে। আশা করি এ বইটি রোগীকে রোগ সচেতন করার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলার গুরুত্ব অনুধাবন করতে সাহায্য করবে।

সাধারণ পাঠক-পাঠিকা এবং গ্লকোমার রোগী ছাড়াও সেবিকা, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের বইটি উপকারে আসবে বলে আশা করা যায়।

গ্লকোমার
সাথে
বসবাস

গ্লকোমার সাথে বসবাস

অধ্যাপক ডা. এম. নজরুল ইসলাম
এমবিবিএস, ডিও, এফসিপিএস (চক্ষু)
ফেলো ইন ফ্যাকো সার্জারি (ব্যাংকক)
আন্তর্জাতিক ফেলো ইন গ্লকোমা (আমেরিকা)

অধ্যাপক ও সিনিয়র কনসালটেন্ট
চক্ষু বিভাগ, বারডেম হাসপাতাল, ঢাকা

সূচীপত্র

প্রকাশক ❑ সাঈদ বারী
প্রধান নির্বাহী, সূচীপত্র
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন ❑ ৭১১৩৮৭১

গ্লকোমার সাথে বসবাস
অধ্যাপক ডা. এম. নজরুল ইসলাম

স্বত্ব ❑ গ্রন্থকার
প্রথম প্রকাশ ❑ ডিসেম্বর ২০১০
প্রচ্ছদ ❑ এম. নজরুল ইসলাম
বর্ণবিন্যাস ❑ নিউ একতা কম্পিউটার, ঢাকা
মুদ্রণ ❑ মৌমিতা প্রেস, প্যারীদাস রোড, ঢাকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশক ❑ মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
যুক্তরাজ্যে পরিবেশক ❑ সঙ্গীতা লিমিটেড
২২, ব্রিকলেন, লন্ডন
কানাডা পরিবেশক ❑ বাংলা মিডিয়া
২৯৭০ ড্যানফোর্থ অ্যাভিনিউ, টরেন্টো

Glaucomar Shathe Bashobash
(Living with Glaucoma)
by Prof. Dr. M. Nazrul Islam
Published by Saeed Bari, Chief Executive, Sucheepatra
38/2Ka, Banglabazar, Dhaka 1100, Bangladesh
e-mail: sucheepatra77@gmail.com, saeedbari07@gmail.com
Web: www.sucheepatra.com

Price : BDT. 200.00 only / US $ 10.00

মূল্য : ৳ ২০০.০০ মাত্র

ISBN 984-70022-0184-1

এই বইয়ের বিষয়বস্তু লেখকের নিজস্ব, লেখকের মতামতের জন্যে প্রকাশক দায়ী নন – প্রকাশক

আমার অনন্যা
একমাত্র কন্যা
সাবা মনিকে

বই নিয়ে কথা

গ্লকোমা চোখের একটা মারাত্মক অসুখ। সারা বিশ্বে অন্ধত্বের একটি প্রধান কারণ হলো গ্লকোমা। এ রোগটি উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশেই প্রায় সমানভাবে বিস্তৃত। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে সারা বিশ্বে এটি অন্ধত্বের দ্বিতীয় প্রধান কারণ এবং সাধারণত পঁয়ত্রিশোর্ধ বয়সের নারী-পুরুষের শতকরা ২ জন এ রোগে ভুগে থাকেন। আমাদের দেশে বহু লোক গ্লকোমা রোগে ভুগে নিজের অজান্তেই সারাজীবনের জন্য অন্ধ হয়ে যান। অথচ এটি কোন দূরারোগ্য ব্যাধি নয়। এ রোগের চিকিৎসা আছে। রোগটির উপসর্গ বা লক্ষণ প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা গেলে খুব সামান্য ওষুধেই রোগটিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং প্রয়োজনবোধে কোন কোন ক্ষেত্রে অপারেশন করলে স্থায়ীভাবে সুস্থ থাকা সম্ভব। অথচ চিকিৎসা শুরু করতে দেরি হলে পরিণতি হচ্ছে অন্ধত্ব।

শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ গ্লকোমার ক্ষেত্রেই রোগীর পক্ষে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগটির কোন উপসর্গ বা লক্ষণ বোঝা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে রোগী যখন অনুভব করেন যে, তিনি চোখে কম দেখছেন বা একেবারেই দেখছেন না, তখন সাধারণত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে যান। এমতাবস্থায় চোখের যা ক্ষতি হয়ে যায় তা স্থায়ীরূপে হয়। তবে দৃষ্টি যেটুকু আছে তা ধরে রাখার জন্যই চিকিৎসার প্রয়োজন।

যেহেতু গ্লকোমা ও চোখের ছানি দু'টো রোগই সাধারণত চল্লিশোর্ধ বয়সে হয় এবং এসব রোগীরা ক্রমশ চোখে কম দেখেন। তাই অনেকে গ্লকোমা হওয়া সত্ত্বেও চোখের ছানি মনে করে চিকিৎসকের কাছে যান না। এসব রোগীর দৃষ্টিশক্তি যখন একেবারে কমে যায় তখন ছানি পেকে গেছে ভেবে এবং অপারেশন করলে ভালো হবেন এ আশা নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। কিন্তু গ্লকোমার

এ পর্যায়ে চিকিৎসা করে আর দৃষ্টি ফেরানো সম্ভব হয় না। তাই রোগীকে বরণ করে নিতে হয় নীরব এ অন্ধত্বকে। সুতরাং এ রোগটি সম্পর্কে রোগীসহ অন্য সকলেরই সচেতন থাকা একান্ত প্রয়োজন। একজন চক্ষু চিকিৎসক হিসেবে সে কারণেই সাধারণ মানুষের মধ্যে গ্লকোমা সম্পর্কে একটি সঠিক এবং সাধারণ ধারণা দেবার আন্তরিক দায়িত্ব অনুভব করেছি। দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে বিষয়টিকে সহজে বোধগম্য করা এবং তাদের সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মাতৃভাষার কোন বিকল্প নেই। আর সেজন্য বাংলাভাষায় এই বই রচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। ইচ্ছাকৃতভাবে একই কথার পুনরাবৃত্তি এবং অত্যন্ত সহজভাবে সবকিছু বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছি, যাতে বইটি সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

রোগী যতক্ষণ না পর্যন্ত এ রোগের চিকিৎসার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত গ্লকোমার সাফল্যজনক নিয়ন্ত্রণ বা সুচিকিৎসা সম্ভব হবে না। চিকিৎসক রোগীকে যখন পরীক্ষা করেন বা প্রথম যখন এ রোগ নির্ণয় করেন তখন এ রোগ সম্পর্কে হয়তো একটি প্রাথমিক ধারণা দেন। কিন্তু এ সময়ে রোগীর সকল প্রকার প্রশ্নের জবাব দেয়া সম্ভব নাও হতে পারে। তাই এই বইটিতে রোগীদের মনের সম্ভাব্য সকল প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিজ্ঞানের অনেক দুরূহ জটিল তথ্য, তত্ত্বকে বাদ দিয়ে রোগী যাতে রোগটিকে সহজভাবে সম্যক উপলব্ধি করে এর চিকিৎসার গুরুত্ব বুঝতে পারেন সেদিকে জোর দিয়েছি। উচ্চরক্তচাপ ও ডায়াবেটিসের মতো গ্লকোমার রোগীও যদি তার চিকিৎসা-উপদেশ সঠিকভাবে বুঝতে পারেন তবেই তিনি তা নিয়মিত পালন করতে পারবেন এবং গ্লকোমা নিয়েই ভালোভাবে বসবাস করতে পারবেন। আশা করি এ বইটি রোগীকে রোগ সচেতন করার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলার গুরুত্বও অনুধাবন করতে সাহায্য করবে।

সাধারণ পাঠক-পাঠিকা এবং গ্লকোমার রোগী ছাড়াও সেবিকা, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের বইটি প্রয়োজনে আসবে বলে আমার বিশ্বাস।

এই বই লেখার এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেকের সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছি। এক্ষেত্রে আমার স্ত্রী নর্দান ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের শিশু বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, সহযোগী অধ্যাপক ডা. নাজমা ইয়াসমীন-এর নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। তিনি আমার পূর্বে প্রকাশিত ৪টি বইয়ের মত এ বইয়েরও পাণ্ডুলিপি পড়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। বইটি লেখার জন্য সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, এজন্যে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এছাড়া আমার দুই পুত্র নিলয় ও ইকরাম এবং একমাত্র কন্যা সাবাকে যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে তার জন্য ওদেরকেও ধন্যবাদ জানাই।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক এম মুস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে *চোখের উচ্চচাপ গ্লুকোমা*- বইটি লিখেছিলাম ১৯৯৪ সালে। তারপর গ্লকোমা সম্পর্কে মাতৃভাষায় কোন বই প্রকাশিত হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। চক্ষু বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমার ২০ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে এই বইটি লেখার চেষ্টা করেছি। তারপরও আমার অজান্তে ভুল-ত্রুটি কিছু থাকতে পারে। আশা করি সহৃদয় পাঠক তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এ সম্পর্কিত যে কোন মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

গ্লকোমার সাথে বসবাস বইটি প্রকাশ করায় সৃজনশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সূচীপত্র-কে ধন্যবাদ জানাই।

বইটি এদেশের মানুষের উপকারে লাগলে আমার শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করবো।

এম. নজরুল ইসলাম
ডিসেম্বর ২০১০

গ্রন্থাকারের অন্যান্য বই

- ❑ চোখ ও চশমা (জানুয়ারি, ১৯৯৪)
- ❑ চোখের উচ্চচাপ গ্লুকোমা (জানুয়ারি, ১৯৯৪)
- ❑ ডায়াবেটিস ও চোখ (সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬)
- ❑ চোখের সাধারণ সমস্য ১০০ প্রশ্ন ও উত্তর (ফেব্রুয়ারি, ২০০৮)

বিষয়সূচি

গ্লকোমার সাথে বসবাস	১৩
চোখের গঠন ও কাজ	১৬
চোখের উচ্চচাপ গ্লকোমা	২৫
গ্লকোমার শ্রেণীবিভাগ	২৭
গ্লকোমা রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা	৩০
জন্মগত গ্লকোমা	৩৮
প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমা	৪১
নরমাল টেনশন গ্লকোমা / লো টেনশন গ্লকোমা	৫১
অকুলার হাইপারটেনশন	৫৩
প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লকোমা	৫৪
প্রাথমিক ও সেকেণ্ডারি গ্লকোমা - কোনটি বেশি ক্ষতিকর	৬২
পানি চা কফি ও গ্লকোমা	৬৩
অন্ধকার ও গ্লকোমা	৬৪
পড়াশোনা সেলাই টিভি ও গ্লকোমা	৬৫
উপসর্গহীন চোখে গ্লকোমা	৬৬
গ্লকোমা ও চোখের ছানি	৬৭
গ্লকোমা রোগীর জন্য ক্ষতিকর ওষুধ	৬৯
গ্লকোমা রোগী ও সমাজের প্রতি তার কর্তব্য	৭০
দেশে-বিদেশে গ্লকোমার প্রভাব	৭১
গ্লকোমা প্রতিরোধ	৭২

গ্লকোমার সাথে বসবাস

গ্লকোমা রোগটি এখন আর দুই দশক আগের মতো অপরিচিত নাম নয়। বাংলাদেশের অনেকেই এখন গ্লকোমা রোগের নাম শুনেছেন এবং চোখের এই রোগটি সম্পর্কে সামান্য হলেও ধারণা আছে।

গ্লকোমা সম্পর্কে অনেকের ভুল ধারণা- গ্লকোমা হলেই চোখ অন্ধ হয়ে যাবে এবং এর কোন চিকিৎসা নেই। এই ধারণায় কিছু সত্যতা থাকলেও পুরোপুরি সত্য নয়।

এটা সত্যি গ্লকোমা চোখের একটি মারাত্মক অসুখ এবং চিকিৎসার পূর্ব পর্যন্ত যেটুকু দৃষ্টি কমে গেছে সেটা আর ফেরত পাওয়া সম্ভব নয়। তবে যেটুকু দৃষ্টি বিদ্যমান আছে সেটুকু সুচিকিৎসা দিয়ে বাঁচানো যায়।

গ্লকোমার সফল অপারেশন হলে সারা জীবনের জন্য আর ড্রপ বা ট্যাবলেট ব্যবহারের প্রয়োজন নাও হতে পারে।

আমি বহুদিন ধরে গ্লকোমার চিকিৎসা করে আসছি এবং লক্ষ্য করেছি গ্লকোমা রোগী মানসিকভাবে অনেকটাই ভেঙ্গে পড়েন। যখন বুঝতে পারেন তার চোখের রোগটি স্থায়ী এবং চোখের দৃষ্টিশক্তি এবং দৃষ্টির পরিসীমা আর কখনও উন্নতি হবে না, তখন তারা খুবই মানসিক চাপে থাকেন।

স্বাভাবিক দৃষ্টির পরিসীমা

গ্লকোমা রোগীর দৃষ্টির পরিসীমা

আমি অনেককেই বোঝাতে সক্ষম হয়েছি- আপনার দৃষ্টি যতটুকু ভালো আছে এটা দিয়ে বাকী জীবন ভালোভাবেই বসবাস করতে পারবেন। তবে তার জন্য দরকার দৈনন্দিন জীবনের কিছু নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত চোখের ওষুধ ব্যবহার করলে এবং চোখের চাপ স্বাভাবিক সীমার মধ্যে রাখতে পারলে ভালো থাকার সম্ভাবনা ৮০-৯০ শতাংশ। বেশিরভাগ গ্লকোমা রোগীই চোখের ফোঁটা ওষুধ ব্যবহার করে ভালো থাকেন। তবে কোন রোগী একটি ওষুধে আবার কেউ কেউ ৩/৪টি গ্লকোমার ওষুধ ব্যবহার করে চোখের চাপ স্বাভাবিক রাখেন।

তবে কারো যদি ওষুধ দিয়ে চোখের চাপ স্বাভাবিক না থাকে তাহলে গ্লকোমার শল্য চিকিৎসা করার প্রয়োজন হতে পারে। শল্য চিকিৎসার ঝুঁকি কিছু বেশি হলেও অন্ধত্ব বরণ করার চাইতে অবশ্যই ভালো। এ বিষয়ে একজন চক্ষু ও গ্লকোমা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে নেয়াই কাম্য।

চিকিৎসার জন্য ওষুধ বা ইনসুলিন ইনজেকশন দিয়ে ডায়াবেটিস রক্তের শর্করা স্বাভাবিক রাখতে হয়, উচ্চ রক্তচাপের জন্য ওষুধ দ্বারা রক্তচাপ স্বাভাবিক মাত্রার মধ্যে রাখতে হয়। এ দুটো রোগই সারা জীবনের রোগ। সারা জীবন এর চিকিৎসা করতে হয়।

গ্লকোমাও সারা জীবনের রোগ। ওষুধ ব্যবহার করে বা শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে চোখের চাপ স্বাভাবিক মাত্রায় রাখতে হবে। ৩/৪ মাস পরপর চিকিৎসককে দিয়ে চোখের চাপ এবং চোখের ভেতরের অপটিক নার্ভের অবস্থা, দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা করাতে হবে।

গ্লকোমা রোগীর বছরে অন্তত একবার চোখের যাবতীয় ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা ছাড়াও দৃষ্টির পরিসীমা পরীক্ষা করা উচিত। এছাড়া চিকিৎসক প্রয়োজন মনে করলে আধুনিক কয়েকটি পরীক্ষা যেমন রেটিনার রঙ্গিন ছবি, ও.সি.টি মেশিনের সাহায্যে রেটিনার নার্ভ ফাইবার এনালাইসিস, অপটিক ডিস্কের পরীক্ষা ইত্যাদি করানো যেতে পারে।

গ্লকোমা চিকিৎসার জন্যে Early Diagnosis বা প্রাথমিকভাবে রোগ নির্ণয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চোখের নার্ভের যত বেশি ক্ষতি হবার পর রোগ নির্ণয় হয়, ততই চিকিৎসা জটিল হতে থাকে। এ জন্যে চশমার পাওয়ার পরিবর্তন বা অন্য কোনো কারণে যখনই চক্ষু

চিকিৎসকের কাছে যাবেন তখনই জেনে নিন আপনার গ্লকোমা আছে কিনা বা গ্লকোমা সন্দেহজনক (Glaucoma suspect) কোন উপসর্গ আপনার আছে কিনা। কারো যদি চোখের চাপ বেশি থাকে, কিংবা অপটিক ডিস্কের পরিবর্তন থাকে তাহলে গ্লকোমার বিশেষ পরীক্ষাসমূহ করে নিশ্চিত হওয়া উচিত তার গ্লকোমা হয়েছে কিনা।

এক ধরনের গ্লকোমায় চোখের চাপ বেড়ে ৬০-৮০ মি.মি. মারকারি হয়ে যায়। এসব রোগীরা চোখের প্রচণ্ড ব্যাথা, দৃষ্টিশক্তি একেবারেই কমে যাওয়া, চোখ লাল হওয়া এসব উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসকের কাছে আসেন। এ সকল রোগীদের অতি দ্রুত চিকিৎসা করতে হবে। ২/১ ঘন্টা দেরিতে এসব রোগীদের চোখের নার্ভ অনেকটাই খারাপ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং কারো ব্যাথাযুক্ত লাল চোখ হলে যত দ্রুত সম্ভব একজন চক্ষু চিকিৎসকের নিকটে যেতে হবে। এ জাতীয় গ্লকোমা রোগীদের শুধু ওষুধে চোখের চাপ স্বাভাবিক হয় না। এজন্য ওষুধ দিয়ে চোখের চাপ যতটা সম্ভব কমিয়ে শল্য চিকিৎসা করতে হবে।

ছোট শিশুদেরও গ্লকোমা হতে পারে। জন্মগত গ্লকোমা থাকলে চোখের আকৃতি বিশেষ করে কর্ণিয়া বা নেত্রস্বচ্ছের আয়তন বাড়তে পারে। চোখ দিয়ে পানি পড়তে পারে, চোখ ট্যারা হয়ে যেতে পারে। এসবের কোন লক্ষণ দেখা গেলে - দ্রুত গ্লকোমা বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। শিশুদের গ্লকোমার চিকিৎসা ওষুধ দিয়ে ভালো ফলাফল পাওয়া যায় না, এজন্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শল্য চিকিৎসা করতে হয় এবং ৭০-৮০ ভাগ ক্ষেত্রে এ চিকিৎসা সফল হয়।

গ্লকোমা হলে দুঃশ্চিন্তা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করালে প্রায় স্বাভাবিক জীবন যাপন করা সম্ভব।

আসুন, আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে গ্লকোমা রোগটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেই এবং গ্লকোমাকে সাথে নিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করি।

চোখের গঠন ও কাজ

গ্লকোমা সম্বন্ধে জানতে গেলে চোখের গঠন এবং কাজ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। চোখ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে রোগটি বিস্তারিতভাবে জানা এবং বোঝা যেমন সহজ হবে, তেমন রোগটি কতটা মারাত্মক তা উপলব্ধি করা যাবে এবং রোগটির প্রতি অবহেলাও কম হবে। এখানে চোখের যে অংশগুলি গ্লকোমা রোগটির সঙ্গে জড়িত সেগুলিই মূলত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো।

চোখ

আমাদের মাথার খুলির সম্মুখভাগে দুটি চক্ষুকোটরের (orbit) মধ্যে চোখ দুটি থাকে। চোখের দুটো পাতার মাঝখানে আমরা চোখের খুব সামান্য অংশই দেখতে পাই; বেশির ভাগ অংশই থাকে চক্ষুকোটরের ভেতরে যা বাইরে থেকে দেখা যায় না। চক্ষুকোটরের মধ্যস্থিত অক্ষিগোলকই চোখের মূল অংশ।

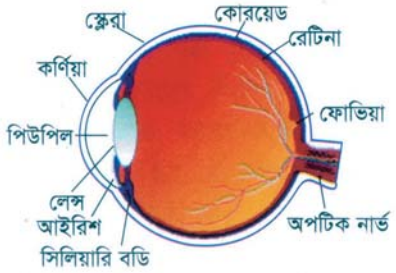

অক্ষিগোলক (Eyeball)

অক্ষগোলকের মধ্যে চোখের জলীয় পদার্থ যেমন অ্যাকুয়াস, ভিট্রিয়াস এবং লেন্স ইত্যাদি থাকে এবং বাইরের আবরণ তিনটি স্তর দিয়ে তৈরি।

সবচেয়ে বাইরের স্তরের নাম-কর্ণিয়া-স্ক্লেরা, মধ্যের স্তর-ইউভিয়াল ট্রাক্ট, সবচেয়ে ভেতরের স্তর - রেটিনা।

অক্ষিগোলকের বাইরের স্তর

বাইরের স্তরটি শক্ত, মোটা ও তন্তুজাত বা ফাইব্রাস টিস্যুর আবরণ। এই স্তরটির সম্মুখের ১/৬ অংশ দেখতে স্বচ্ছ এবং বেশি উত্তল বা কনভেক্স। এর নাম কর্নিয়া। এটা দেখতে কাচের মতো স্বচ্ছ। কর্নিয়ার পেছনে আইরিস থাকার কারণে একে কালো বা বাদামী মনে হয়। কর্নিয়ার ভেতর দিয়েই চোখে আলো প্রবেশ করে। এতে কোন রক্তনালী নেই, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে স্নায়ু বা নার্ভ রয়েছে।

এই স্তরের পেছনের ৫/৬ অংশ অর্থাৎ কর্নিয়া বাদে বাকি অংশ বেশ পুরু, সাদা এবং অসচ্ছ। একে বলা হয় স্ক্লেরা। চোখের পাতার ভেতর দিক এবং স্ক্লেরা একটি পাতলা পর্দায় ঢাকা - একে বলে কনজাংটিভা (নেত্রবর্ত্মকলা)। এই পর্দায় অনেক সুক্ষ্ম রক্তবাহী নালী আছে।

কর্নিয়া ও স্ক্লেরার মিলনস্থানকে বলে লিম্বাস। এই লিম্বাস চোখের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। কারণ চোখের ভেতর থেকে অ্যাকুয়াস হিউমার এই লিম্বাসের বিভিন্ন অংশের (structure) ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চোখের বাইরের রক্তনালী, শিরায় প্রবেশ করে। এই লিম্বাসে কোন প্রকার অসুবিধা থাকলে অনেক সময় চোখের চাপ বা প্রেসার বেড়ে গিয়ে গ্লকোমার সৃষ্টি হতে পারে।

স্ক্লেরার গায়েই রেকটাস মাংশপেশীগুলি লাগানো থাকে যার ফলে চোখ বিভিন্ন দিকে ঘোরানো যায়।

স্ক্লেরার পেছন দিয়ে অপটিক নার্ভ বা অক্ষিস্নায়ু বের হয়। এছাড়া ৪টি বড় শিরা (ভেনা ভরটিকোসি), চোখের ভেতর থেকে স্ক্লেরার ভেতর দিয়ে বাইরে বের হয় এবং অপটিক নার্ভের চতুর্দিক দিয়ে ছোট ও বড় সিলিয়ারি ধমনি চোখের মধ্যে প্রবেশ করে।

অক্ষিগোলকের মধ্যস্তর

বাইরের স্তর- স্ক্লেরা-কর্নিয়া এবং ভেতরের স্তর রেটিনার মাঝখানে থাকে মধ্যস্তর- ইউভিয়াল ট্রাক্ট। ইউভিয়াল ট্রাক্ট-এর ৩টি অংশ- পেছন থেকে সামনে (ক) কোরয়েড (খ) সিলিয়ারি বডি
(গ) আইরিস।

(ক) সবচেয়ে বড় ও পেছনের চকোলেট রংএর রক্তনালীতে ভরা অংশের নাম কোরয়েড। এই স্তরে ছোট বড় ধমনি, শিরা রয়েছে যা চোখের পুষ্টি সরবরাহ করে।

(খ) কোরয়েডের সামনের দিকে সিলিয়ারি বডি অবস্থিত। সিলিয়ারি বডিতে সিলিয়ারি প্রসেস রয়েছে - যার কোষ থেকেই চোখের অ্যাকুয়াস হিউমার তৈরি হয়ে থাকে। এছাড়া সিলিয়ারি বডির পেছনে সুতার মতো সাসপেনসরি লিগামেন্ট থাকে - যা লেন্সের ক্যাপসুলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে এবং লেন্সকে ঝুলিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

(গ) ইউভিয়াল ট্রাক্ট-এর সবচাইতে সামনের অংশটুকুকে আইরিস বলে। সিলিয়ারি বডির পাদদেশ থেকে আরম্ভ হয়ে অক্ষিতারা বা পিউপিল পর্যন্ত এটা বিস্তৃত। আইরিসের রং অনুযায়ী চোখকে কালো হরিণ চোখ, বিড়ালাক্ষী বা কটা চোখ ইত্যাদি ভাষায় বর্ণনা করা হয়।

আইরিসের ঠিক মাঝখানে যে ছিদ্র থাকে তাকেই বলা হয় পিউপিল বা অক্ষিতারা। আলো এর ভেতর দিয়ে চোখে প্রবেশ করে। চোখের কর্নিয়া এবং লেন্সের মধ্যবর্তী স্থানকে আইরিস (ডায়াফ্রাম বা পর্দার মতন) দুই ভাগে ভাগ করেছে। সামনের অংশটির নাম সামনের বা অ্যান্টেরিয়র চেম্বার Anterior chamber) আর পেছনের অংশটির নাম পেছনের বা পস্টেরিয়র চেম্বার (Posterior chamber)।

পস্টেরিয়র চেম্বারে সিলিয়ারি বডি থেকে অ্যাকুয়াস হিউমার তৈরি হয় এবং পিউপিলের মধ্য দিয়ে অ্যান্টেরিয়র চেম্বারে প্রবেশ করে। এখান থেকে লিম্বাস হয়ে চোখের বাইরে চলে যায়।

অক্ষিগোলকের ভেতরের স্তর

অক্ষিগোলকের আবরণের তিনটি স্তরের সবচেয়ে ভেতরের স্তরের নাম অক্ষিপট বা রেটিনা। এটাকে নার্ভাস স্তর বলে কারণ এই স্তরেই চোখে প্রবেশকৃত আলোকে ধারণ করবার মতো স্নায়ুকোষ রয়েছে। এখান থেকে আলো অপটিক নার্ভের সাহায্যে মস্তিষ্কে পৌঁছে এবং আমরা দেখতে পাই।

অপটিক ডিস্ক

রেটিনার যে স্থান থেকে অপটিক নার্ভ আরম্ভ হয় তাকে অপটিক ডিস্ক বলা হয়। এর পরিধি ১.৫ মি.মি.। অফথ্যালমোস্কোপ যন্ত্র দিয়ে এটা দেখতে চাকতি বা থালার মতো মনে হয়। এর রং কিছুটা হালকা সুতরাং সহজেই একে চেনা যায়। এর মধ্যখানে একটু গর্তের মতো থাকে - তাকে ফিজিওলজিক্যাল কাপ বলে।

গ্লকোমা বা চোখের উচ্চচাপ রোগে এই ফিজিওলজিক্যাল কাপ বড় হতে থাকে এবং যখন কাপটি অপটিক ডিস্কের সমান হয়ে যায় তখন ঐ ব্যক্তি সাধারণত অন্ধ হয়ে যান।

লেন্স (Lens)

অক্ষিগোলকের আইরিস ও ভিট্রিয়াসের মধ্যে ৯-১০ মি.মি. পরিধির ও ৪-৫ মি.মি. পুরু একটি লেন্স আছে। ভিট্রিয়াস বডির সামনের দিকে একটি খাদ আছে যেখানে লেন্সটি থাকে। এছাড়া সিলিয়ারি বডির সাপপেন্সারি লিগামেন্ট দিয়েও এটা ঝুলানো থাকে।

চোখের এই লেন্সটি উভয়দিকে উত্তল (convex) অর্থাৎ বাইকনভেক্স। দূরে এবং কাছে দেখার জন্য লেন্সের পুরুত্ব-এর পরিবর্তন হয়। এর ফলে চোখের পাওয়ার-এর পরিবর্তন ঘটে এবং পরিস্কার দেখতে সাহায্য করে।

ভিট্রিয়াস বডি

স্বচ্ছ জেলির মতো আঠালো ভিট্রিয়াস অক্ষিগোলকের ৪/৫ ভাগ জুড়ে থেকে এটা চোখের আকার ও স্থিরতা বজায় রাখে। ভিট্রিয়াস লেন্সের পেছন থেকে আরম্ভ করে রেটিনার অপটিক ডিস্ক পর্যন্ত বিস্তৃত। ভিট্রিয়াসের মধ্যে কোন রক্তনালী নাই - তাই অ্যাকুয়াস থেকে এটা পুষ্টি লাভ করে।

অ্যাকুয়াস হিউমার (Aqueous humour)

অ্যাকুয়াস হিউমার খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রায় পানির মতো স্বচ্ছ তরল পদার্থ। এটি চোখের পেছনের ও সামনের চেম্বারে থাকে। অনবরত তৈরি হয় ও চোখের কয়েকটি অংশের পুষ্টি প্রদান করে এবং এসব অংশের বর্জ্য বা অপ্রয়োজনীয় পদার্থ (waste products) নিয়ে চোখ থেকে বেরিয়ে যায়।

তৈরির প্রক্রিয়া

অ্যাকুয়াস হিউমার তৈরি নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। তবে গ্রহণযোগ্য মতে হচ্ছে ঃ

(১) ক্ষরণ (Active secretion)

সিলিয়ারি বডির যে ৭০টি সিলিয়ারি প্রসেস রয়েছে তার ভেতরের দিকে রয়েছে নন পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম (NPE) নামের কোষ। এই কোষ থেকে ৮০% অ্যাকুয়াস হিউমার ক্ষরণ প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়ে পেছনের চেম্বারে পতিত হয়।

(২) অধি-পরিস্রবন (Ultra filtration)

২০ শতাংশ অ্যাকুয়াস এই প্রক্রিয়ার তৈরি হয়ে পেছনের চেম্বারে আসে। রক্ত ও অ্যাকুয়াস হিউমারের মধ্যে একটি পর্দা (Blood acueous barrier) কাজ করে বলে এই প্রক্রিয়ার সামান্য অ্যাকুয়াস তৈরি হয়।

(৩) পরিব্যপ্তি (Diffusion)

নন পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম কোষের দেয়ালে চর্বিজাতীয় পদার্থ আছে, যার মাধ্যমে চর্বিতে দ্রবণীয় খুব সামান্য পদার্থ রক্ত থেকে অ্যাকুয়াস হিউমার হয়ে পেছনের চেম্বারে আসতে পারে।

অ্যাকুয়াস সঞ্চালন (Aqueous circulation)

প্রতি মিনিটে মাত্র ২ মাইক্রোলিটার অ্যাকুয়াস তৈরি হয়ে চোখের

পেছনের চেম্বারে পতিত হয়। সেখান থেকে পিউপিল দিয়ে সামনের চেম্বারে প্রবেশ করে। পেছনের চেম্বারে মাত্র ০.০৬ মিলিলিটার এবং সামনের চেম্বারে মাত্র ০.২৫ মিলিলিটার অ্যাকুয়াস থাকে। প্রতি ১০০ মিনিটে পুরাতন অ্যকুয়াস ধীরে ধীরে চোখ থেকে বেরিয়ে যায় এবং নতুন অ্যাকুয়াস অল্প অল্প এসে সেই স্থান পূরণ করে।

সামনের চেম্বারে আইরিসের গরমে (রক্তনালী থাকার দরুণ আইরিস গরম হয়) এবং ঠান্ডা কর্নিয়ার (বাতাসের সংস্পর্শে থাকে বলে কর্নিয়া ঠান্ডা থাকে এবং এর মধ্যে কোন রক্তনালী নেই) কারণে অ্যাকুয়াস স্রোতের ন্যায় চারিদিকে ঘুরতে থাকে ও চোখ থেকে বেরিয়ে যায়। অ্যাকুয়াস দুটি পথ দিয়ে চোখ থেকে বেরিয়ে যায়।

(ক) শতকরা ৯০ ভাগ অ্যাকুয়াস সামনের চেম্বার থেকে এর কোণে (Angle of A/C) লিম্বাসের পেছনের ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্কে যায় এবং সেখান থেকে শ্লেম্‌স ক্যানাল হয়ে স্ক্লেরার সংগ্রাহক নালীতে (collecting duct) পৌঁছায়। সেখান থেকে স্ক্লেরাল ভেনাস প্লেক্সাস ও পরে এপিস্ক্লোরাল ভেনাস প্লেক্সাস হয়ে অ্যানটেরিয়র সিলিয়ারি শিরায় প্রবেশ করে সিস্টেমিক রক্ত সঞ্চালনের (Systemic circulation) সঙ্গে মিশে যায়। সংগ্রাহক নালী থেকে সামান্য অ্যাকুয়াস সরাসরি অ্যাকুয়াস শিরা দিয়ে অ্যান্টেরিয়র সিলিয়ারি শিরায় যায়। এই পথকে কনভেনশনাল (conventional) পথ বলা হয়।

(খ) অ্যাকুয়াস হিউমারের বাকি শতকরা ১০ ভাগ সামনের চেম্বারের কোণে সিলিয়ারি বডিতে প্রবেশ করে এবং কিছু অংশ সিলিয়ারি বডি ও করয়েডের শিরায় প্রবেশ করে, আর বাকি অংশ স্ক্লেরাতে পরিব্যপ্ত হয়ে অক্ষিকোটরে চলে যায়। এই পথকে ইউভিও স্ক্লেরাল পথ (Uveo scleral outflow) বা আন্‌কন-ভেনশনাল (unconventional) পথ বলা হয়ে থাকে।

অ্যাকুয়াস হিউমারের কাজ

(১) চোখের সামনের অংশকে পূর্ণ করে এবং প্রতিসরাঙ্ক মাধ্যম (refractive media) হিসেবে কাজ করে।

(২) চোখের যে সকল অংশে রক্ত সরবরাহ নেই যেমন কর্নিয়া, লেন্স, সাসপেন্সরি লিগামেন্ট, ট্রাবিকিউলার মেশওয়ার্ক ও ভিট্রিয়াস বডিকে খাবার ও পুষ্টি দেয় এবং এ সকল অংশ থেকে বিপাক প্রক্রিয়ায় (metabolic waste products) বর্জ্য অংশ বের করে দেয়।

(৩) অ্যাকুয়াস নামক তরল পদার্থ তৈরি হওয়া ও নিয়ন্ত্রিত সঞ্চালনের মাধ্যমে চোখের অভ্যন্তরীণ চাপের (Intraocular pressure) সমতা রক্ষিত হয়।

অ্যাকুয়াসের জৈবরসায়ন

প্রায় পানির মতো এই অ্যাকুয়াস হিউমার সরাসরি রক্ত থেকে তৈরি হয় না বলে এর গঠন রক্তের প্লাজমার কাছাকাছি- কিন্তু এক নয়। অ্যাকুয়াসের পানির পরিমাণ শতকরা ৯৯.৯ ভাগ, আর বাকি শতকরা ০.১ ভাগ কঠিন পদার্থ (Solid)। কঠিন পদার্থের মধ্যে রয়েছে সোডিয়াম ক্লোরাইড, বাইকার্বোনেট, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ভিটামিন সি এবং খুব সামান্য পরিমাণে গ্লুকোজ ও প্রোটিন।

রক্ত ও অ্যাকুয়াসের মধ্যে পর্দা (Blood aqueous barrier) থাকার দরুণ অ্যাকুয়াসে গ্লুকোজ এবং প্রোটিনের পরিমাণ খুবই কম। তবে চোখের কয়েকটি অসুখে যেমন ইউভিয়াইজিএ (Uveitis) এই পর্দার অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে যায় বলে, রক্ত থেকে প্রোটিন খুব বেশি চলে আসে। (যা স্লিট ল্যাম্প নামক যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায়)।

চোখের চাপ/চোখের অভ্যন্তরীন চাপ (Intra Ocular Pressure, I.O.P.) চোখের অভ্যন্তরীণ চাপ বলতে আইবলের আবরণীর পার্শ্বচাপকে বোঝায়। স্বাভাবিক অবস্থায় চোখের এই চাপ ১০ মি.মি. মারকারি থেকে ২১ মি.মি. মারকারি এর মধ্যে

থাকে। দিনে রাতে বিভিন্ন সময়ে এই চাপের পরিবর্তন হতে পারে। খুব সকালে, ৬টার দিকে চোখের অভ্যন্তরীণ চাপ সবচাইতে বেশি বৃদ্ধি পায় এবং তা ৩-৪ মি.মি. বৃদ্ধি পেতে পারে। সন্ধ্যা ৬ টার দিকে চাপ সবচাইতে কম থাকে। যাদের চোখে উচ্চচাপ হবার প্রবণতা আছে তাদের রক্তের চাপ বেড়ে গেলে সাময়িকভাবে চোখের চাপ বেড়ে যেতে পারে। আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময়ও চোখের চাপের সামান্য পরিবর্তন হয়। বেশি করে পানি খেলে চোখের চাপ বেড়ে যেতে পারে। আবার অনেকক্ষণ অন্ধকারে কাজ করলেও চাপ বাড়তে পারে।

তবে যখনই বা যে কারণেই হোক চোখের চাপ ২১ মি.মি. মারকারির বেশি হলে তা স্বাভাবিক নয়। তখন আমরা বলি চোখের উচ্চচাপ। চোখের চাপ ২২ থেকে ৩০ মি.মি. হলে এবং অপটিক নার্ভের কোন ক্ষতি না হলে ঐ অবস্থাকে বলা হয় অকুলার হাইপারটেনশন (Ocular Hypertension)। অন্যদিকে চোখের চাপ ২১ মি.মি. কম হয়ে যদি অপটিক নার্ভের ক্ষতি হতে থাকে তাহলে নরমাল টেনশন গ্লকোমা বলা হয়। এ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আর এই উচ্চচাপ অপটিক নার্ভের ক্ষতি করার ফলে যদি দৃষ্টিক্ষমতা দৃষ্টির পরিসীমা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তাকে গ্লকোমা বলে।

চোখের উচ্চচাপ - গ্লকোমা

গ্লকোমা রোগ বলতে কি বুঝায়

চোখের অভ্যন্তরীণ চাপ ১০ মি.মি. মারকারি থেকে ২১ মি.মি. মারকারি পর্যন্ত। সাধারণতঃ এই চাপ কোন কারণে বেড়ে গেলে চোখের অপটিক নার্ভ ও অন্যান্য অংশের ক্ষতিসাধন করে, দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়, বিশেষ করে দৃষ্টির পরিসীমার পরিবর্তন হয়। চোখের এই অবস্থার নামই গ্লকোমা।

আগেই বলা হয়েছে যে, চোখের সামনের ভাগে পেছনের চেম্বারে অনবরত যে তরল পদার্থ বা অ্যাকুয়াস হিউমার তৈরি হচ্ছে তা সামনের চেম্বারের কোণ (Angle of Anterior Chamber) দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। কোন কারণে এই অ্যাকুয়াস বেশি তৈরি হলে কিংবা চোখ থেকে বেরিয়ে যাবার পথে বাধার সৃষ্টি হলে চোখের অভ্যন্তরীণ চাপ বেড়ে যায় এবং গ্লকোমা রোগের উৎপত্তি হয়।

০ অনেক সময় এ রোগে কোন উপসর্গ ছাড়াই চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

০ কোন কোন ক্ষেত্রে উপসর্গের মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে চোখ অন্ধ হতে পারে।

০ আবার অনেক শিশু এই রোগ নিয়ে জন্মাতে পারে।

আমাদের দেশে পঁয়ত্রিশোর্ধ বয়সীদের ক্ষেত্রে এই রোগের প্রভাব শতকরা ২ ভাগ। ক্রমশ দৃষ্টিহীন হওয়া ছাড়া আর কোন উপসর্গ না থাকার দরুণ অনেক রোগী প্রায় অন্ধ হয়ে চক্ষু বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হন। তখন কোন চিকিৎসা করা আর সম্ভব হয় না।

০ এক ধরনের গ্লকোমাতে চোখ লাল হয় এবং প্রাথমিক অবস্থায় তেমন কোন অসুবিধা না হওয়ায় রোগীরা সাধারণ চোখ ওঠা মনে

করে ভালো চিকিৎসা করান না, এর ফলেও গ্লকোমা রোগ নির্ণয়ে বিলম্ব ঘটে। এসব বিষয় বিবেচনা করে যাতে গ্লকোমা রোগে চোখ অন্ধ না হয়, সেজন্য এই রোগটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা দরকার।

কিভাবে চোখের চাপ বাড়ে

ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে শক্ত আবরণের একটি পানির পাত্রে যদি ওপর থেকে নলের সাহায্যে পানি আসে তা নিচের নল দিয়ে বের হয়ে যায়। (চিত্র-ক)। কিন্তু যদি নিচের নলটিকে একটি সুতা দিয়ে হালকা বা জোরে বেঁধে দেওয়া হয়, তাহলে পানি ফোটা ফোটা পড়বে কিংবা বন্ধ হয়ে যাবে। (চিত্র-খ)। তখন পানির পাত্রটি যদি সম্প্রসারিত হওয়ার (ইলাস্টিকের মতো) ক্ষমতা না থাকে তাহলে এর অভ্যন্তরীণ চাপ বেড়ে যাবে।

অনুরূপভাবে চোখের মধ্যে ক্রমাগত অ্যাকুয়াস তৈরি হচ্ছে এবং বেরিয়ে যাচ্ছে। কোন কারণে বেরোবার রাস্তাটিতে বাধা পেলে বা বন্ধ হয়ে গেলে, যেহেতু চোখের আয়তন বড় হতে পারে না, সে কারণে চোখের অভ্যন্তরীণ চাপ বেড়ে গিয়ে চোখের বিভিন্ন অংশের ক্ষতিসাধন করতে থাকে। বিশেষ করে রেটিনার গাংলিওন কোষ ধ্বংস হয়ে যায় এবং অপটিক নার্ভ আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। ফলে তার দৃষ্টির পরিধি আস্তে আস্তে সংকুচিত হতে থাকে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিশক্তিও লোপ পায় এবং শেষ পর্যায়ে অন্ধ হয়ে যায়।

গ্লকোমার শ্রেণীবিভাগ

রোগের উৎপত্তি এবং কারণ অনুযায়ী গ্লকোমাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তবে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

ক) প্রাথমিক গ্লকোমা

খ) সেকেন্ডারি গ্লুকোমা।

(ক) প্রাথমিক গ্লকোমা (Primary Glaucoma) ঃ এই ধরনের গ্লকোমা চোখের সামনের চেম্বারের কোন বিকাশগত ত্রুটির জন্য হয়ে থাকে। সাধারণত দুই চোখই প্রাথমিক গ্লকোমায় আক্রান্ত হয়। ৩৫ বছর বয়সের পরে নারী বা পুরুষ উভয়েরই এই ধরনের গ্লকোমা হতে পারে। এই রোগ সাধারণত বংশানুক্রমিক হয়ে থাকে।

চোখের অ্যাকুয়াস হিউমার বেরিয়ে যাবার পথে অর্থাৎ সামনের চেম্বারের কোণে, কোন কারণে বাধা সৃষ্টি হলে যদি চোখের চাপ বেড়ে যায় তবে তাকে প্রাথমিক গ্লকোমা বলা হয়। এখানে চোখের বা শরীরের অন্য কোন রোগের সঙ্গে চাপ বাড়ার সম্পর্ক থাকে না। প্রাথমিক গ্লকোমাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়-

১। জন্মগত গ্লকোমা

২। প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমা

৩। প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লকোমা

১। **প্রাথমিক জন্মগত গ্লকোমা** (Primary Congenital Glaucoma): সামনের চেম্বারের অ্যাঙ্গেলে বিকাশগত ত্রুটির কারণে এই রোগ হতে পারে।

২। **প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমা** (Primary Open Angle Glaucoma, POAG): এই গ্লকোমাতে সামনের চেম্বার-এর কোণ বা অ্যাঙ্গেল স্বাভাবিক চোখের মতোই খোলা থাকে। অ্যাঙ্গেল দেখার যন্ত্র গোনিওস্কোপ (Gonioscope) দিয়ে দেখলে স্বাভাবিক দেখা যায় এবং কোন ত্রুটি পাওয়া যায় না। এই

ধরনের গ্লকোমাই সাধারণত বংশাণুক্রমিক হয়ে থাকে এবং এদের সামনের চেম্বারের কোণে বিকাশগত ত্রুটির কারণে অ্যাকুয়াস বেরিয়ে যেতে পারে না। ফলে চোখের চাপ অনেক বছর ধরে আস্তে আস্তে বাড়ে।

৩। **প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লকোমা** (Primary Angle Closure Glaucoma) এই রোগীর সামনের চেম্বার জন্মগতভাবে স্বল্প গভীর থাকে এবং সামনের চেম্বারের কোণ সরু থাকে। সাধারণত যাদের দূর-দৃষ্টি বা হাইপারমেট্রপিয়া (Hypermetropia) আছে তাদের এই রোগ বেশি হয়। কোন কারণে যদি এই সামনের চেম্বারের সরু কোণ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে অ্যাকুয়াস-এর বহির্গমন বন্ধ হয়ে যায়, ফলে চোখের চাপ হঠাৎ করে বেড়ে যায়।

(খ) সেকেন্ডারি গ্লকোমা (Secondary Glaucoma) : চোখের বা শরীরের অন্য কোন রোগে চোখের চাপ বৃদ্ধি পেলে তাকে সেকেন্ডারি গ্লকোমা বলা হয়। এ ধরণের গ্লকোমা সাধারণত এক চোখে হয়ে থাকে। চোখের ও শরীরের বহু কারণেই চোখের চাপ বেড়ে সেকেন্ডারি গ্লকোমা হতে পারে। খুব সাধারণ (Common) কারণগুলি নিচে উল্লেখ করা হল।

সেকেন্ডারি গ্লকোমার সাধারণ কারণসমূহ:

১। চোখে আঘাতজনিত

২। চোখের প্রদাহ যেমন ইউভিয়াইটিজ (Uveitis) স্ক্লেরাইটিজ (Scleritis) ইত্যাদির জটিলতা হিসেবে

৩। চোখের ভেতরে রক্তক্ষরণ হলে (Hyphaema)

৪। চোখের লেন্স ফুলে গেলে, যেমন ছানির প্রাথমিক পর্যায়ে

৫। লেন্সের স্থানচ্যুতি হলে

৬। ছানি বেশি পেকে গেলে

৭। চোখের ছানির অস্ত্রোপচারের জটিলতা হিসেবে

৮। চোখের ভেতর কোন টিউমার হলে

৯। চোখে নতুন ধমনি বা শিরা তৈরি হয়ে অ্যাঙ্গেল বন্ধ করলে (Neovascular Glaucoma)

১০। কেন্দ্রীয় রেটিনাল শিরা বন্ধ হয়ে গেলে (Central Retinal Vein Occulsion)

১১। কোন কোন ওষুধ, যেমন- স্টেরয়েড, এট্রপিন-জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করলে

এই ধরনের গ্লকোমার কারণ দূর করতে পারলে এবং গ্লকোমার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করলে, এই রোগ ভালো হয়ে যাবার অনেক সম্ভাবনা থাকে।

গ্লকোমা রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা

গ্লকোমা রোগ নির্ণয়ের জন্য চোখের সাধারণ পরীক্ষা ছাড়াও বিশেষ কয়েকটি পরীক্ষা প্রয়োজন, যেমন-

(ক) চোখের চাপ নির্ণয়
(খ) অপটিক ডিস্ক-এর পরীক্ষা
(গ) দৃষ্টির পরিসীমা পরীক্ষা
(ঘ) গোনিওস্কোপি বা সামনের চেম্বারের অ্যাঙ্গেল পরীক্ষা
(ঙ) প্যাকিমেট্রি - কর্ণিয়ার পুরুত্ব নির্ণয় (CCT) ।

এছাড়াও প্রারম্ভিক গ্লকোমা রোগ নির্ণয়ের জন্য রেটিনার ইমেজিংসহ আরও কয়েকটি আধুনিক পরীক্ষা সম্বন্ধে পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে ।

(ক) চোখের চাপ (Intra Ocular Pressure, I.O.P.) নির্ণয় কর

স্বাভাবিক অবস্থায় চোখের চাপ ১০ মি.মি. মারকারি থেকে ২১ মি.মি. মারকারির মধ্যে থাকে । চোখের চাপ মাপার পদ্ধতিকে বলা হয় টনোমেট্রি (Tonometry) । চক্ষু চিকিৎসকগণ অনেক সময় চোখের ওপরের পাতার ওপরে দুটি আঙ্গুল দিয়ে চোখের চাপ পরীক্ষা করে থাকেন । এতে সঠিক চাপ জানা না গেলেও খুব বেশি বা কম চাপ থাকলে সহজেই বোঝা যায় । সঠিকভাবে ও সূক্ষ্মভাবে (Quantitative) চাপ মাপার জন্য চিকিৎসকগণ বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন । এর কয়েকটি সম্পর্কে বলা হল ।

(১) অ্যাপলানেশন টনোমিটার (Applanation Tonometer)

ছবিতে গোল্ডম্যান অ্যাপলানেশন টনোমিটার দেখা যচ্ছে । এটিকে স্লিট ল্যাম্পে বসিয়ে রোগীর চোখের চাপ মাপা হয় । এই পদ্ধতিতে বর্তমানে সবচাইতে সঠিকভাবে চোখের চাপ মাপা যায় ।

এই যন্ত্রটির সামনে একটি ডাব্‌ল প্রিজম রয়েছে যা কর্নিয়ার ওপর মাত্র ৩.০৬ মি.মি. স্পর্শ করে । এই প্রিজম এর সাহায্যে কর্নিয়াকে সামান্য চ্যাপ্টা করে (Applanation) চোখের চাপ মাপা হয় । এই পদ্ধতিতে চোখের চাপ মাপাকে বলা হয় অ্যাপলানেশন টনোমেট্রি (Applanation Tonometry) ।

অ্যাপলানেশন টনোমিটারের সাহায্যে চোখের চাপ নির্ণয় করা হচ্ছে

বর্তমানে গোল্ডম্যান অ্যাপলানেশন টনোমিটার ছাড়া আরও কয়েকটি অ্যাপলানেশন টনোমিটার দিয়ে চোখের চাপ মাপা হয়। এগুলিতে স্লিট ল্যাম্পের প্রয়োজন হয় না। যেমন-
পারকিন্স হাতে ধরা টনোমিটার
টনোপেন ইত্যাদি।

পারকিন্স হাতে ধরা টনোমিটার
(Perkins hand-held tonometer)

টনোপেন
(tonopen)

প্যাসক্যাল ডায়নামিক কনটুর টনোমিটার
(Dynamic contour tonometer, DCT)

চোখের চাপ মাপার জন্যে এটি অত্যাধুনিক অ্যাপলানেশন টনোমিটার। এই মেশিনে লেসিক অপারেশন করার পর বা

কর্ণিয়ার পূরুত্বের ওপরে চোখের চাপ নির্ভর করে না। এলসিডিতে নির্ণীত চোখের চাপ দেখা যায়।

সেল্‌ফ টনোমিটার (Self tonometer)

গ্লকোমা রোগে যদি প্রতিদিনই চোখের চাপ মাপার প্রয়োজন হয় তাহলে প্রতিদিন চিকিৎসকের নিকটে না গিয়ে - এ সেল্‌ফ টনোমিটারের সাহায্যে রোগী নিজেই নিজের চোখের চাপ মাপতে পারেন।

অস্পর্শ-বায়ুযুক্ত টনোমিটার (Non Contact tonometer, NCT)

এই যন্ত্রের সাহায্যে চোখে স্পর্শ না করে কর্নিয়াতে বাতাসের সামান্য ধাক্কা দিয়ে চোখের চাপ মাপা হয়। স্পর্শ করার প্রয়োজন হয় না বিধায় এই পদ্ধতিতে চোখ অবশ করার ফোটার প্রয়োজন হয় না।

চোখের পানির মাধ্যমে সংক্রামক হেপাটাইটিস, এইডস ইত্যাদি রোগের জীবাণুও এক রোগী থেকে অন্য রোগীর চোখে সংক্রমিত হতে পারে না। এনসিটিতে যে চোখের চাপের মাপ আসে তা সাথে সাথে ছাপিয়ে নেয়া যায় এবং রোগী প্রয়োজনে সংরক্ষণ করতে পারেন। তবে নানা কারণে এই যন্ত্রে চোখের চাপের রিডিংটি সবসময় সম্পূর্ণ সঠিক নাও হতে পারে।

(২) শিওটজ টনোমিটার (Schiotz tonometer)

ছবিতে দেখা যাচ্ছে এই যন্ত্রের প্লাঞ্জার নামক নিচের অংশটিকে চোখের কর্ণিয়ার ওপর বসানো হয়। প্লাঞ্জারটি কর্ণিয়াকে কতটুকু গর্ত করবে (Indentation) তা ঐ চোখের চাপের ওপর নির্ভর করে এবং সেই অনুযায়ী এই যন্ত্রে স্কেলের কাঁটা সরে যায়। যন্ত্রের সঙ্গে দেয়া একটি কাগজে স্কেলের রিডিং কত হলে চোখের চাপ কত হবে তার একটি তালিকা থাকে - এ থেকে মোটামুটি সঠিকভাবে চোখের চাপ বোঝা যায়। এই যন্ত্রটি সস্তা, সহজেই

শিওটজ টনোমিটার

শিওটজ টনোমিটার-এর সাহায্যে চোখের চাপ মাপা হচ্ছে

ব্যবহার করা যায়, যে কোন স্থানে বহনযোগ্য। চোখের চাপ মাপার জন্য এই যন্ত্রটি দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি ব্যবহারের জন্য স্লিট ল্যাম্পের প্রয়োজন হয় না বলে যেখানে বিদ্যুৎ নেই সেসব এলাকাতে গিয়েও এর সাহায্যে চোখের চাপ মাপা যায়। আমাদের দেশে চোখের চাপ মাপবার জন্য এই টনোমিটার এখনও ব্যবহৃত হয়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এই পদ্ধতিতে চোখের চাপ মাপাকে ইনডেনটেশন টনোমেট্রি (Indentation tonometry) বলা হয়।

(খ) অপটিক ডিস্ক (Optic Disc)-এর পরীক্ষা

ছবিতে ফান্ডাস (Fundus) বা রেটিনার যে অংশ অপথ্যালমোস্কোপি পরীক্ষায় দেখা যায় তা দেখা যাচ্ছে। মাঝখানের গোল অংশটির নাম অপটিক ডিস্ক। অপটিক নার্ভ এখান থেকে শুরু। এই অপটিক ডিস্কের মাঝে আর একটি ছোট গর্ত (cup) রয়েছে যার নাম অপটিক কাপ। সাধারণত এই কাপ ও ডিস্কের অনুপাত ০.২ থেকে ০.৪-এর মধ্যে থাকে। এটাকে ফিজিওলজিকাল কাপ ডিস্ক অনুপাত ধরা হয়। চোখের চাপ বেড়ে গেলে অর্থাৎ গ্লকোমাতে এই কাপ ডিস্কের অনুপাত বেড়ে গিয়ে ০.৬, ০.৭ ইত্যাদি এমনকি ১.০ অর্থাৎ ডিস্কের পুরাটাই কাপ হয়ে যেতে পারে। এই কাপ-ডিস্কের অনুপাত দেখে অপটিক নার্ভের কতটা ক্ষতি হয়েছে তা অনুমান করা যায়।

স্লিটল্যাম্প পরীক্ষা

স্বাভাবিক অপটিক ডিস্ক

ডাইরেক্ট অফথ্যালমোস্কপি করে রেটিনার অপটিক ডিস্ক দেখা হচ্ছে

স্লিটল্যাম্প ও ভক লেন্সের সাহায্যে দুই চোখ দিয়ে অপটিক ডিস্ক দেখা হচ্ছে

গ) গোনিওস্কোপি (Gonioscopy)

ছবিতে গোনিও লেন্স নামক একটি লেন্স কর্নিয়ার ওপর বসিয়ে এবং স্লিট ল্যাম্প মাইক্রোসকোপের সাহায্যে চোখের সামনের চেম্বারের অ্যাঙ্গেল দেখা হচ্ছে।

চিত্র ক

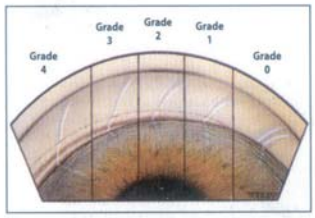

চিত্র খ

সাধারণত এই যন্ত্রের সাহায্যে অ্যাঙ্গেল দেখতে ওপরের ছবির মতো দেখা যায় (চিত্র-ক-খ)। এই অ্যাঙ্গেল ০° ডিগ্রি থেকে ৪০°-৪৫° ডিগ্রি পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং সে অনুসারে সামনের চেম্বারের অ্যাঙ্গেলকে মোট ৫টি গ্রেডে ভাগ করা হয়েছে। অ্যাঙ্গেলটি কোন গ্রেডের তা দেখে গ্লকোমার সঠিক প্রকার নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। যেমন ২০° থেকে ৪৫°-এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল হলে এবং চোখের চাপ বেড়ে গেলে তাকে অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমা বলা হয়। আবার ২০° এর নিচে ১০° বা ০° অ্যাঙ্গেল হয়ে চাপ বেড়ে গেলে তাকে অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লকোমা বলে। অ্যাঙ্গেলে অনেক সময় পিগমেন্ট, রক্তের নালি, বা অন্য কোন বস্তু আটকে থেকে চোখের চাপ

বাড়াতে পারে ও সেকেন্ডারি গ্লকোমা হতে পারে।

গোনিও লেন্সের সাহায্যে এভাবে অ্যাঙ্গেল দেখার পদ্ধতিকে বলা হয় গোনিওস্কোপি।

(ঘ) দৃষ্টির পরিসীমা (Field of Vision, Perimetry) **পরীক্ষা**

গ্লকোমা রোগ নির্ণয়ের জন্য দৃষ্টির পরিসীমা মাপা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন প্রকার গ্লকোমাতে দৃষ্টির পরিসীমার নানা রকম পরিবর্তন হতে দেখা যায়।

বিভিন্ন প্রকার পেরিমিটার-এর সাহায্যে দৃষ্টির পরিসীমা নির্ণয় করা হচ্ছে

হামফ্রে অটোমেটেড পেরিমিটার

মেডমন্ট অটোমেটেড পেরিমিটার

অক্টোপাস অটোমেটেড পেরিমিটার

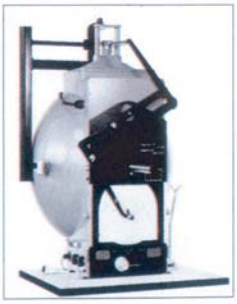

গোল্ডম্যান পেরিমিটার

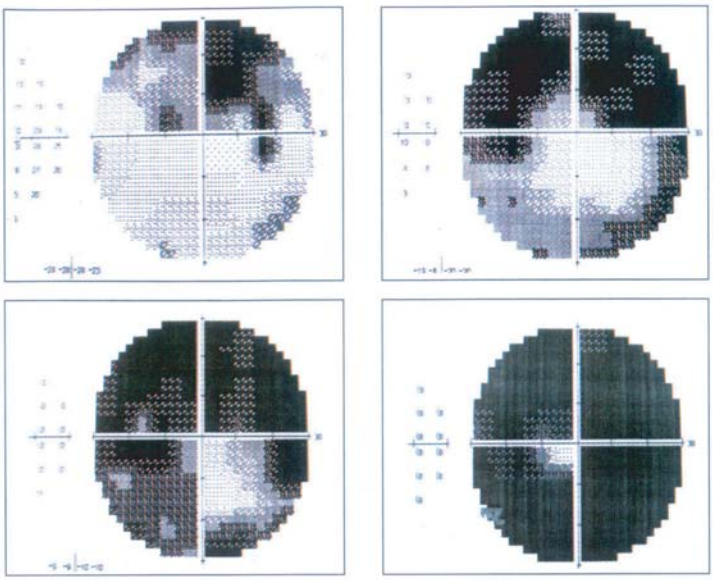

উপর্যুক্ত ছবিসমূহে হামফ্রে অটোমেটেড পেরিমটারের সাহায্যে
দৃষ্টির পরিসীমার ক্রমাবনতি দেখানো হয়েছে

প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমাতে প্রথমেই কেন্দ্রীয় দৃষ্টির পরিসীমা-এর (Central field of vision) পরিবর্তন হতে দেখা যায় এবং রোগের শেষ দিকে পার্শ্বীয় দৃষ্টির পরিসীমাতে (Peripheral field of vision) পরিবর্তন আসে।

অপটিক ডিস্কে পরিবর্তন পাওয়া গেলে এই পরীক্ষাটি করা উচিত এবং এর সাহায্যে রোগীর দৃষ্টির কতটা ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা বোঝা যাবে।

জন্মগত গ্লকোমা
(Congenital Glaucoma)

এই রোগটি শিশুদের মারাত্মক একটি চোখের রোগ হলেও এর হার খুব কম। প্রতি দশ হাজার শিশুর মধ্যে প্রায় একটি শিশুর জন্মগত গ্লকোমা হয়। এই রোগটির বংশগত সম্পর্ক আছে। শতকরা ৬৫ ভাগ ছেলে শিশুর এবং ৩৫ ভাগ মেয়ে শিশুর এই গ্লকোমা হয়ে থাকে। শতকরা ৭৫ ভাগ ক্ষেত্রে দুই চোখই আক্রান্ত হয়। যদিও দুইটি চোখে রোগের মাত্রা কম বেশি থাকতে পারে।

কারণ

এই গ্লকোমার সঠিক কারণ জানা যায় না। তবে কয়েকটি তত্ত্বকেই গ্রহণ করা হয়, যেমন-

১। সামনের চেম্বার এর অ্যাঙ্গেলের ওপর দিয়ে একটি ঝিল্লি বা মেমব্রেন থাকতে পারে, এটি অ্যাকুয়াস নির্গমনে বাধা দেয়।

২। শ্লেমস ক্যানাল সরু থাকতে পারে, এমন কি অনুপস্থিত থাকতে পারে।

লক্ষণ

১। চোখের চাপ বাড়ার ফলে কর্নিয়াতে পানি জমে ঘোলা হয়ে যায়। শিশুর বাবা-মা সাধারণত এই লক্ষণটিই প্রথম দেখে থাকেন।

২। চাপ বাড়ার ফলে শিশুর চোখ বড় হয়ে যায়। শিশুর বয়স তিন বছর বা তার আগে চাপ বাড়লে কর্নিয়া ও স্ক্লেরা বড় হয়ে গরুর চোখের মতন বড় দেখায়। এই চোখকে বলা হয় বুফথ্যালমাস (Buphthalmos)

৩। চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়তে পারে।

৪। আলো ভীতি হতে পারে। কর্ণিয়ায় পানি জমার ফলে শিশু আলোর দিকে তাকাতে পারে না। অনেক শিশু এই অবস্থায় প্রায় সারাদিনই আলোতে চোখ বন্ধ করে থাকে।

৫। চোখে কম দেখা- অনেক সময় বাবা-মা লক্ষ্য করে থাকেন তাদের সন্তান চোখে কম দেখছে।

পরীক্ষা করলে দেখা যায়

১। কর্নিয়া ১২ মি.মি. থেকে বেশি বড় হতে পারে এবং কর্নিয়াতে দাগ থাকতে পারে।

২। সামনের চেম্বার খুব গভীর দেখায়।

৩। চোখের চাপ অনেক বেশি থাকে ও ডিস্কে কাপিং থাকে (শিশুকে অজ্ঞান করে এসব পরীক্ষা করা হয়)।

৪। বিশেষ ধরনের গোনিও লেন্সের সাহায্যে গোনিওস্কোপি করা হলে রোগের কারণ অনেক সময় নির্ণয় করা সম্ভব হয় এবং চিকিৎসার সুবিধা হয়।

নিচের ছবিতে বাম চোখের তুলনায় ডান চোখ এবং এর কর্নিয়াকে বড় দেখা যাচ্ছে।

চিকিৎসা

জন্মগত গ্লকোমাতে ওষুধ দিয়ে সাধারণত কোন লাভ হয় না। অপারেশন করেই চিকিৎসা করা হয়। তবে রোগের অবস্থা কোন পর্যায়ে তা বিবেচনা করে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

রোগের প্রাথমিক অবস্থায় রোগী চিকিৎসকের কাছে আসলে গোনিওটমি, গোনিওপাংচার, ট্রাবিকুলোটমি এবং ট্রাবিকুলেকটমি বা গ্লকোমা ভাল্‌ভ ইমপ্ল্যান্ট ইত্যাদি অপারেশন করা যেতে পারে। কিন্তু চিকিৎসার জন্য খুব দেরি করে আসলে এবং চোখের দৃষ্টি একেবারে না থাকলে অপারেশনের পরিবর্তে চোখের চাপ কমাবার ওষুধ দেয়া হয়ে থাকে।

ট্রাবিকুলোটমি এবং ট্রাবিকুলেকটমি

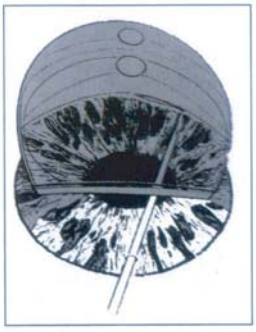

গোনিওপাংচার

কোন কোন সময় শিশুর চোখে খুব ব্যথা হয় কিংবা উচ্চচাপের ফলে চোখ নষ্ট হয়ে অন্ধ হয়ে যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে চোখ তুলে ফেলার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমা
(Primary Open Angle Glaucoma, POAG)

পঁয়ত্রিশোর্ধ প্রতি ১০০ সাধারণ মানুষের মধ্যে অন্তত একজন এ ধরণের গ্লকোমায় ভুগে থাকেন। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী আমেরিকা ও যুক্তরাজ্যে অন্ধত্বের শতকরা ১২ ভাগ কারণ এই ধরনের গ্লকোমা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই রোগটি বংশাণুক্রমিক। অন্তত শতকরা ১০ ভাগ রোগীর নিকটাত্মীয় এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

উপসর্গ

প্রাথমিক অবস্থায় অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমার কোন উপসর্গ হয় না। রেটিনার গ্যাংলিওন কোষ নষ্ট হয়ে আস্তে আস্তে অপটিক ডিস্কের ক্ষতি হয়ে দৃষ্টির পরিসীমা কমে যায় এবং রোগী দৃষ্টিশক্তি হারায়।

পরীক্ষা

(১) অপটিক ডিস্কের পরিবর্তন:

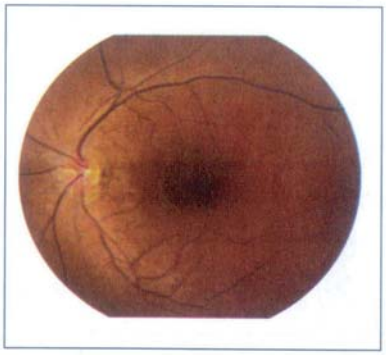

রোগী কোন পর্যায়ে চিকিৎসকের কাছে আসেন তার ওপর নির্ভর করে, অপটিক ডিস্কের পরিবর্তন। অপটিক ডিস্কের পরিবর্তনের প্রাথমিক অবস্থায় কাপ-ডিস্কের অনুপাত ০.৪ থেকে ০.৫-এর মধ্যে থাকে এবং পরে তা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং শেষে এই অনুপাতে ১.০-এ দাঁড়ায়।

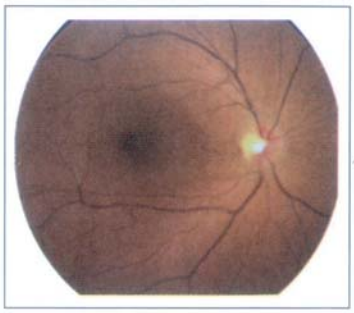

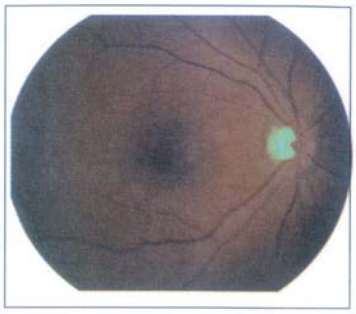

উপরের ছবিগুলোতে অপটিক ডিস্কে কাপ-ডিস্কের অনুপাত এর পরিবর্তন দেখানো হয়েছে

(২) চোখের চাপঃ প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমাতে চোখের চাপ সাধারণত ২৫ থেকে ৩৫ মি.মি. মারকারির মধ্যে পাওয়া যায় এবং ৪০ মি.মি. মারকারির বেশি চোখের চাপ বাড়ে না।

(৩) গোনিওস্কোপি: এই পরীক্ষায় সামনের চেম্বারের অ্যাঙ্গেল ২০° থেকে ৪৫° পর্যন্ত থাকে অর্থাৎ অ্যাঙ্গেল খোলা থাকে।

(৪) দৃষ্টির পরিসীমা: কাপ-ডিস্কের পরিবর্তন অনুসারে দৃষ্টির পরিসীমার পরিবর্তন দেখা যায়। কেন্দ্রীয় দৃষ্টির পরিসীমায় অন্ধ-বিন্দুর বড় হওয়া, জেরামস্ স্কোটমা, আইসোলেটেড প্যারাসেন্ট্রাল স্কোটমা, আরকুয়েট স্কোটমা, ডাবল আরকুয়েট স্কোটমা ইত্যাদি নানা ধরণের পরিবর্তন দেখে চিকিৎসকগণ দৃষ্টির পরিসীমার ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকেন।

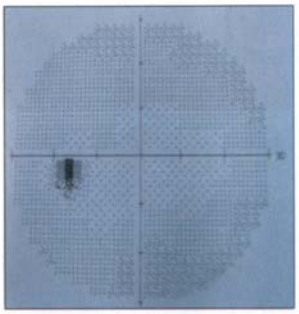

স্বাভাবিক দৃষ্টির পরিসীমা

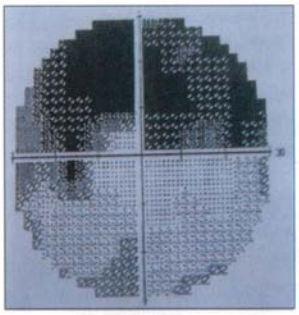

অগ্রসর গ্লকোমায় উপরের দৃষ্টির পরিসীমা আক্রান্ত হয়েছে

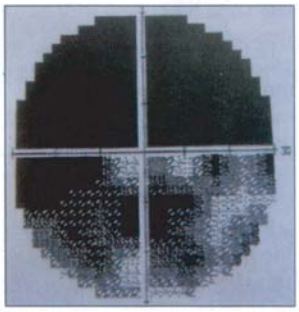

অতি অগ্রসর গ্লকোমায় উপরের এবং নিচের দৃষ্টির পরিসীমা আক্রান্ত হয়েছে

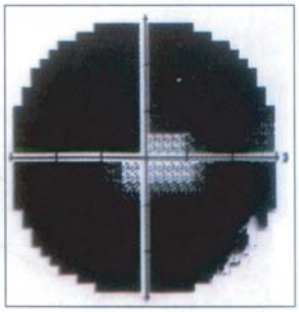

চূড়ান্ত গ্লকোমায় শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় দৃষ্টির পরিসীমা বিদ্যমান

(৫) অপটিকাল কোহেরেন্স টমোগ্রাফি বা ওসিটি (O.C.T): এই যন্ত্রের সাহায্যে চোখের রেটিনার নার্ভ ফাইবার লেয়ার এনালাইসিস (RNFL Analysis) করলে দেখা যায় রেটিনার পুরুত্ব (thickness) স্বাভাবিকের চাইতে অনেক কমে গেছে। এছাড়া এই যন্ত্রের সাহায্যে অপটিক ডিস্কের কাপ-ডিস্কের অনুপাত, নিউরোরেটিনাল রিম (NRR) এর পরিমাণ ইত্যাদি সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায়।

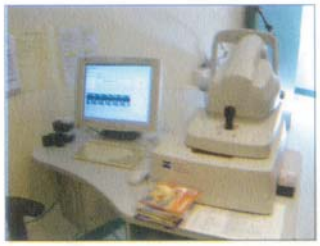

ওসিটির প্রিন্টআউট

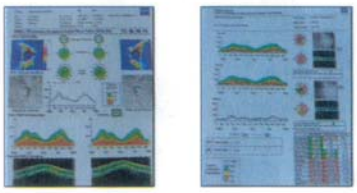

রেটিনার নার্ভ ফাইবার লেয়ার এনালাইসিস

(৬) এইচআরটি (HRT): অপটিক ডিস্কের পরিমাপ, কাপ ডিস্কের অনুপাত ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য এই যন্ত্রটি খুবই উপযোগী।

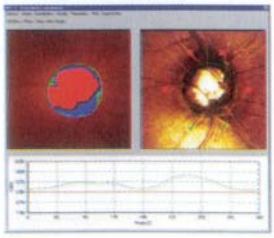

(৭) জি.ডি.এক্স. (G.D.X): রেটিনার নার্ভ ফাইবার লেয়ারের পুরুত্ব মাপার জন্য এই যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়। প্রারম্ভিক গ্লকোমাতে বা সন্দেহজনক গ্লকোমাতে রেটিনার নার্ভ ফাইবার লেয়ারের পুরুত্ব অনেক কমে যায়।

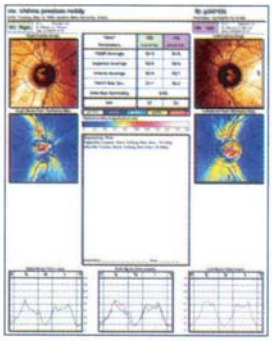

(৮) প্যাকিমেট্রি: কর্নিয়ার পুরুত্ব মাপা হলে অকুলার হাইপারটেনশান বা নরমাল টেনশন গ্লকোমা রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

৯) কালার ফান্ডাস ফটোগ্রাফি: গ্লকোমা রোগে রেটিনা এবং অপটিক ডিস্কের পরিবর্তন ডকুমেন্টেশন-এর জন্য এই পরীক্ষাটি করা হয়।

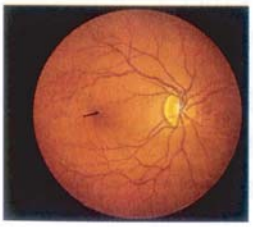

গ্লকোমার চিকিৎসা

সাধারণত তিনভাবে চিকিৎসা করা যায়: (ক) ওষুধের সাহায্যে (খ) লেজার চিকিৎসা ও (গ) অপারেশন।

ক) ওষুধের সাহায্যে - প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমার চিকিৎসা মূলত ওষুধ ব্যবহার করেই করা হয়ে থাকে। এ রোগটি ওষুধে স্থায়ী ভাবে ভালো হয় না, কিন্তু চোখের চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে ঠিক রক্তের উচ্চচাপের মতো। সারা জীবন এই রোগের জন্য ওষুধ ব্যবহার করে চোখের চাপ স্বাভাবিক রাখা হয়।

চোখের ড্রপ- ব্রাইমোনিডিন (Briomonidine), টিমোলোল (Timolol), ল্যাটানোপ্রস্ট (Latanoprost), ট্রাভোপ্রস্ট (Travoprost), বিমাটোপ্রস্ট (Bimatoprost), ডরজোলামাইড (Dorzolamide), ব্রিনজোলামাইড (Brinzolamide), পাইলো-কারপিন (Pilocarpine) এবং খাবার ওষুধ এসিট্যাজোলামাইড (Acetazolamide) দিয়ে গ্লকোমার চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

কোন্ প্রকার ওষুধ কোন্ রোগীর জন্য বেশি কার্যকর তা চক্ষু বিশেষজ্ঞগণই নির্ধারণ করে থাকেন। যেমন- যাদের হার্টের অসুখ বা হাঁপানি রোগ আছে তাদেরকে টিমোলোল জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয় না।

গ্লকোমা রোগীর রোগ এর পর্যায় বিবেচনা করে কয়টি ওষুধ প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। যেমন ঃ গ্লকোমার প্রারম্ভে (Early Glaucoma) মাত্র একটি ড্রপ দিনে ১ বার দিলেই চোখের চাপ স্বাভাবিক হতে পারে। আবার অতি অগ্রসর গ্লকোমা (Advanced Glaucoma) রোগীদের ক্ষেত্রে ৩/৪টি ড্রপ দিয়ে চোখের চাপ নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হতে পারে।

গ্লকোমার প্রতিটি ওষুধেরই কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। এসব বিষয়ে রোগীদের সাথে আলোচনা করে বিশেষজ্ঞগণ গ্লকোমার চিকিৎসা করে থাকেন।

খ) লেজার চিকিৎসা - চোখের কোণে ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্কে লেজার এর সাহায্যে চিকিৎসা করলে সাময়িকভাবে চোখের চাপ কমে যায়। প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমার জন্য দুই ধরনের লেজার করা হয়ে থাকে।

ক) আরগন লেজার ট্রাবিকুলোপ্লাস্টি
(Argon Laser Trabeculoplasty, ALT)

খ) সিলেকটিভ লেজার ট্রাবিকুলোপ্লাস্টি
(Selective Laser Trabeculoplasty SLT)

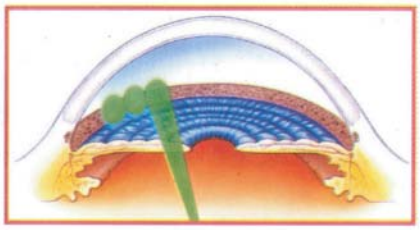

উন্নত বিশ্বে SLT এখন বেশ জনপ্রিয়। এটি কোল্ড লেজার বিধায় এই লেজার বার বার দেয়া যায়। সঠিকভাবে করলে SLT এর কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। যাদের চোখে গ্লকোমার ওষুধ ব্যবহার করলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বেশি হয় তাদের জন্য SLT খুবই কার্যকর।

বিশ্বের অনেক গ্লকোমা বিশেষজ্ঞ গ্লকোমার প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে ওষুধের পূর্বে SLT করে থাকেন।

ALT- লেজার মাত্র একবারই করা যায় এবং এই লেজারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেশি বিধায় এর ব্যবহার তুলনামূলক অনেক কম।

গ) অপারেশন - ওষুধ দিয়ে যদি রোগীর গ্লকোমা নিয়ন্ত্রণে না আনা যায় অর্থাৎ আশানুরূপ চোখের চাপ (Target IOP) এর

নিচে না থাকে কিংবা দৃষ্টির পরিসীমা কমতে থাকে তাহলে অপারেশন করে চোখের চাপ কমানো হয়। এই অপারেশনে চোখের সামনের চেম্বারের সঙ্গে কনজাংটিভার নিচের একটি সংযোগ তৈরি করা হয়। ফলে অ্যাকুয়াস সামনের চেম্বার থেকে সরাসরি কনজাংটিভার বা পাতলা স্ক্লেরার নিচে প্রবাহিত হয়ে চোখের চাপ কমিয়ে দেয়। এই অপারেশনের নাম ফিলট্রেশন সার্জারি (Filtration Surgery), যা কয়েকভাবে করা সম্ভব। তবে এ ধরনের আধুনিক এবং সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ফিলট্রেশন সার্জারি হচ্ছে ট্রাবিকুলেকটমি (Trabeculectomy).

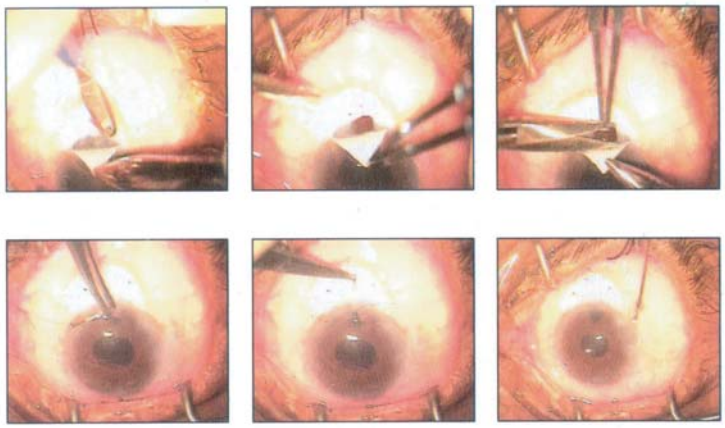

গ্লকোমার অন্যান্য শল্য চিকিৎসা

বেশির ভাগ গ্লকোমার জন্য ট্রাকিুলেকটমি সবচেয়ে সফল এবং জনপ্রিয় শল্য চিকিৎসা। যদিও বিভিন্ন সার্জন এই অপারেশনটি নানা রকম পরিবর্তন (Modification) করে সম্পন্ন করে থাকেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি ট্রাবিকুলেকটমি এর সাথে মাইটোমাইসিন সি, রিলিজঅ্যাবল সুচার কিংবা ওলোজেন কোলাজেন ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করে থাকি। গ্লকোমার বর্তমান অবস্থান এর উপর ভিত্তি করেই এইসব পরিবর্তন করা হয়ে থাকে।

ট্রাবিকুলেকটমি ছাড়া গ্লকোমার নানা শল্য চিকিৎসা রয়েছে। রোগীর প্রয়োজন এবং সার্জন এর পছন্দ অনুযায়ী এ সকল চিকিৎসা বেছে নেয়া হয়। নিচে এরকম শল্য চিকিৎসার কয়েকটি নাম দেয়া হল।

ক) নন-পেনিট্রেটিং ডিপ স্ক্লেরেকটমি
(Non Penetrating Deep Sclerectomy- NPDS)

খ) ভিসকো ক্যানালোস্টমি (Visco-canalostomy)

গ) ড্রেনেজ ইমপ্ল্যান্ট বা ভাল্ব ইমপ্ল্যান্ট সার্জারি (Drainage Implant surgery) যেমন- আহমেদ, বারভেল্ট, মল্টেনো ইত্যাদি গ্লকোমা ভাল্ব ইমপ্ল্যান্ট।

ঘ) এক্সপ্রেস মিনি শান্ট ইমপ্ল্যান্ট ট্রাবিকুলেকটমি (Express Mini shunt implant trabeculactomy)

ঙ) মিনি ট্রাবিকুলেকটমি
(Mini Trabeculectomy)

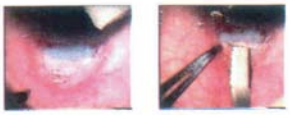

চ) ওলোজেনসহ ট্রাবিকুলেকটমি

(Trabeculectomy with ologen collagen matrix)

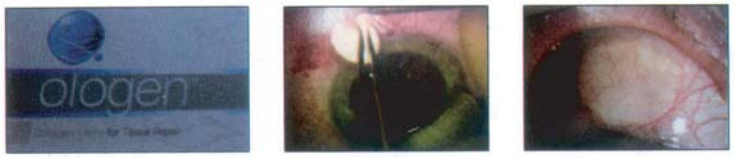

অপারেশন ও উন্নয়নশীল দেশ

সম্প্রতি উন্নয়নশীল দেশে প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমার চিকিৎসা হিসেবে প্রথমেই অপারেশন করার কথা বলা হচ্ছে। কারণ–

১। গ্লকোমা চিকিৎসার ওষুধ বেশি দামি।

২। অনেক সময় সব ওষুধ পাওয়া যায় না।

৩। রোগী নিয়মিত ব্যবহার না-ও করতে পারেন।

৪। সারাজীবন ব্যবহার করা অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না।

৫। একবার অপারেশন করলে শতকরা ৮০ ভাগ রোগীর সাধারণত বাকি জীবনে ওষুধ ছাড়াই চোখের চাপ স্বাভাবিক থাকে। বাকি শতকরা ২০ ভাগ রোগী অপারেশনের পর ওষুধ ব্যবহার করে অথবা আবার অপারেশন করে ভালো থাকেন।

নরমাল টেনশন গ্লকোমা / লো টেনশন গ্লকোমা

(Normal Tension Glaucoma / Low Tension Glaucoma)

প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমার মতো এটি এক ধরনের গ্লকোমা যেখানে অপটিক নার্ভ ও দৃষ্টির পরিসীমায় প্রমাণিত পরিবর্তন দেখা যায় কিন্তু চোখের চাপ স্বাভাবিক অর্থাৎ ২১ মি.মি. মারকারির কম থাকে। এজন্য এ ধরনের গ্লকোমাকে নরমাল টেনশন বা লো টেনশন গ্লকোমা বলা হয়ে থাকে। চোখের চাপ কম থাকলেও কেন গ্লকোমা হয় এ নিয়ে অনেক মতভেদ ও তত্ত্ব (Theory) আছে। অনেকের মতে, কিছু মানুষের স্বাভাবিক মাত্রার চোখের চাপও ঐ বিশেষ চোখটির জন্য বেশি এবং অপটিক নার্ভের পরিবর্তন করতে সক্ষম।

অনেকে মনে করেন, ঐ রোগীর জীবনে জন্মের সময় বা পরে কোন এক সময়ে রক্তের চাপ অত্যন্ত কমে যাওয়ায় চোখের ভেতরে ও অপটিক নার্ভে রক্ত সরবরাহ কমে গিয়ে অপটিক নার্ভের ক্ষতিসাধন করেছিল। ফলে তার চোখের কাপ-ডিস্ক অনুপাত বেড়ে যায় এবং দৃষ্টির পরিসীমা কমে যায়। পরবর্তীকালে রক্তের চাপ স্বাভাবিক হয়ে যাবার ফলে বিনা ওষুধেই চোখের চাপ স্বাভাবিক বা কম থাকে।

অন্য এক তত্ত্ব অনুযায়ী, রোগীর চোখের চাপ যখন মাপা হয় তখন হয়তো স্বাভাবিক থাকে কিন্তু দিনে বা রাতে কোন এক সময়ে চোখের চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায় এবং অপটিক নার্ভের ক্ষতিসাধন করে থাকে। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে লো টেনশন গ্লকোমা রোগীদের প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর অন্তর মোট ২৪ ঘণ্টা চোখের চাপ মাপ হয়ে থাকে। এই পরীক্ষার নাম ফেজিং (Phasing)। এই পরীক্ষায় যদি দেখা যায়, কোন বিশেষ সময়ে রোগীর চোখের চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তাহলে

রোগ নির্ণয়সহ চিকিৎসারও সুবিধা হয়। দিন রাতের ঠিক যে সময়টিতেও ঐ চাপ বেড়ে যায় তার এক ঘণ্টা আগে চোখের চাপ কমাবার ড্রপ দিলে চাপ স্বাভাবিক থাকবে এবং চোখের পুনরায় ক্ষতির সম্ভাবনা কমে যাবে। Prostaglandin Anaglogue গ্রুপের ওষুধ ব্যবহার করলে ২৪ ঘণ্টারও বেশিক্ষণ চোখের চাপ কম থাকে। রোগ নির্ণয় হয়ে গেলে প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমার অনুরূপ অপারেশন করেও এই রোগীর চিকিৎসা করা যেতে পারে। এ রোগে সাধারণত চোখের চাপ ১২ মি.মি. মারকারি বা তার চেয়ে কম রাখার চেষ্টা করা হয়।

অকুলার হাইপারটেনশন
(Ocular Hypertension)

অনেক মানুষের চোখের চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি থাকতে পারে কিন্তু এদের পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় অপটিক ডিস্কের কাপ-ডিস্ক অনুপাত স্বাভাবিক এবং দৃষ্টির পরিসীমাও স্বাভাবিক তাহলে তাদেরকে বলা হয় অকুলার হাইপারটেনশন। এসব রোগীর কেউ কেউ ভবিষ্যতে অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমা রোগীতে রূপান্তরিত হতে পারেন বিধায় এদেরকে গ্লকোমা সাসপেক্ট (Glaucoma Suspect) বলা হয়। প্যাকিমেট্রি - পরীক্ষা করলে কর্ণিয়ার ঘনত্ব (CCT) স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পাওয়া যেতে পারে। সাধারণত কোন ওষুধের প্রয়োজন হয় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঐ একটু বেশি চোখের চাপ হয়তো ঐ চোখের জন্য স্বাভাবিক এবং তা অপটিক নার্ভের জন্য ক্ষতিকর নয়।

চিকিৎসা

অকুলার হাইপারটেনশনের রোগীদেরকে সাধারণত কোন চিকিৎসা দেবার প্রয়োজন হয় না। তবে যদি ফলো আপ পরীক্ষাতে অপটিক নার্ভ বা দৃষ্টির পরিসীমার কোন পরিবর্তন হতে থাকে তাহলে প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমার মতো চিকিৎসা দিতে হয়।

প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লকোমা
(Primary Angle Closure Glaucoma, PACG)

প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লকোমা চোখের একটি জরুরি রোগ। চল্লিশোর্ধ বয়সের প্রতি ১০০০ সাধারণ মানুষের প্রায় একজন এই রোগে ভুগে থাকেন। মহিলাদের এই রোগ পুরুষের চেয়ে অন্তত চারগুণ বেশি হয়। অনেকক্ষেত্রেই রোগটি বংশগত এবং দুই চোখই আক্রান্ত হতে দেখা যায়। সেজন্য একটি চোখের অসুখ ধরা পড়লে, আপাতত ভালো অন্য চোখেরও চিকিৎসা প্রয়োজন হয়।

এই ধরনের গ্লকোমার উপসর্গ খুব সহজেই বোঝা যায়, ফলে রোগী সাধারণত দ্রুত চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হয়ে থাকেন। এই রোগের উপসর্গ এতই স্পষ্ট যে কোন কোন ক্ষেত্রে চক্ষু বিশেষজ্ঞ টেলিফোনে রোগের বিবরণ শুনেই রোগ নির্ণয় করতে পারেন।

কাদের বেশি হয়

অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লকোমা কয়েকটি বিশেষ ধরনের চোখে বেশি হয়, যেমন, ছোট আকারের চোখ। এই চোখের বৈশিষ্ট হল:

১। চোখের সামনে-পেছনের দূরত্ব কম থাকায় আইরিস, লেন্স, ডায়াফ্রাম সামনের দিকে থাকে

২। স্বল্প গভীর সামনের চেম্বার

৩। সরু সামনের চেম্বারের অ্যাঙ্গেল

৪। তুলনামূলকভাবে চোখের লেন্স বড়

৫। চোখের কর্নিয়ার আকার ছোট

৬। হাইপারমেট্রপিয়া বা চোখে বেশি প্লাস পাওয়ারের দরকার হয়

ছোট আকারের চোখে এসব বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে সামনের

চেম্বারের অ্যাঙ্গেলে অ্যাকুয়াস নির্গমন কোন কোন সময়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং চোখের চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। মানুষের স্বাভাবিক কাজকর্মের সময় কখনও কখনও পিউপিল বড় হতে পারে। যেমন:

১। অন্ধকারে অনেক সময় কাটালে যেমন, সিনেমা হলে, আলোকচিত্রীদের অন্ধকার ঘরে ইত্যাদি

২। স্বল্প আলোয় পড়াশুনা, সেলাই করলে

৩। দুশ্চিন্তায় বা ভয় পেল

৪। অন্ধকারে অনেকক্ষণ টেলিভিশন দেখলে

৫। কোন কারণে চোখে এট্রপিন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করলে

আর এ ধরনের ছোট চোখে এসব সময়ে পিউপিল বড় হয়ে আইরিসের প্রান্ত গিয়ে অ্যাঙ্গেলকে আংশিকভাবে বন্ধ করে দিতে পারে।

এসব রোগী উজ্জল আলোতে চলে আসলে বা ঘুমিয়ে পড়লে আবার পিউপিল ছোট হয়ে সামনের চেম্বারের অ্যাকুয়াস নির্গমনে সহায়তা করে ফলে সাময়িক বর্ধিত চোখের চাপ কমে যায়।

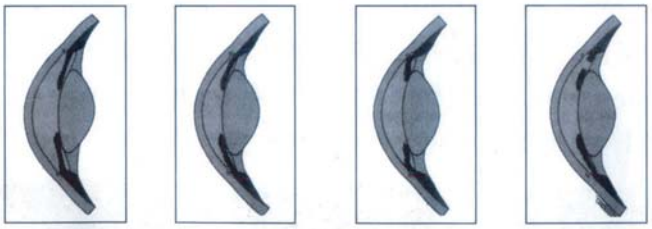

ক খ গ ঘ

(ক) স্বাভাবিক সামনের চেম্বার ও স্বাভাবিক অ্যাঙ্গেল

(খ) স্বল্প গভীর সামনের চেম্বার ও সরু অ্যাঙ্গেল

(গ) অন্ধকারে বা কোন কারণে পিউপিল বড় হয়ে আইরিসের প্রান্ত দিয়ে অ্যাঙ্গেলকে আংশিকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে

(ঘ) পেরিফেরাল আইরিডেকটমি করার পর আংশিক বন্ধ অ্যাঙ্গেল আবার খুলে গেছে

প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লকোমার বিভিন্ন পর্যায়

প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লকোমার উপসর্গ ও অবস্থা অনুযায়ী কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যেমন:

১। সুপ্ত পর্যায়, সন্দেহজনক পর্যায় (Angle closure suspect)

২। সবিরাম পর্যায় (Intermittent Angle closure)

৩। অ্যাকুট কনজেস্টিভ পর্যায় (Acute congestive)

৪। দীর্ঘস্থায়ী পর্যায় (Chronic angle closure)

৫। চূড়ান্ত পর্যায় (Absolute Angle closure)

১। সুপ্ত পর্যায় (Latent stage/Angle closure suspect)

এই পর্যায়ে সাধারণত রোগীর কোন উপসর্গ থাকে না। চোখের চাপ স্বাভাবিক থাকে। কিন্তু চোখ পরীক্ষা করলে স্বল্প গভীর সামনের চেম্বার, লেন্স-আইরিস সামনে আগানো, ছোট কর্নিয়া এবং গোনিওস্কোপিতে গ্রেড ১ বা ২ অ্যাঙ্গেল দেখা যায়।

আলট্রাসাউন্ড বায়োমাইক্রোসকপি Ultrasound Biomicroscopy (UBM) কিংবা অ্যানটেরিয়র সেগমেন্ট ওসিটি (Anterior Segment OCT) যন্ত্রের সাহায্যে সঠিকভাবে চোখের কোণ পরীক্ষা করা যায়।

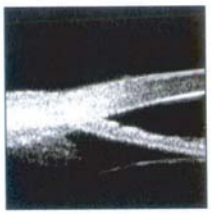

এ সকল যন্ত্রপাতির সুযোগ না থাকলে ডার্ক রুম টেস্ট (Dark Room Test) অথবা মাইড্রিয়েটিক টেস্ট করা হয়। যদি চোখের চাপ এই পরীক্ষার আগে ও পরে ৮ মি.মি. মারকারির অধিক হয়

তাহলে এ সকল রোগী কোন এক সময়ে অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লকোমাতে আক্রান্ত হবেন।

এদেরকে একটি ছোট অপারেশন, পিপিআই (Prophylactic Peripheral Iridectomy) বা লেজার পেরিফেরাল আইরডোটমি (LPI) করলে সারা জীবনের জন্য অ্যাকুট গ্লকোমার হার কমে যায়।

সুতরাং চল্লিশোর্ধ মহিলা ও পুরুষের বাৎসরিক চক্ষু চেকআপের সময় এই গ্লকোমার সুপ্ত পর্যায় নির্ণয় করা গেলে, চোখের কোন ক্ষতি হবার আগেই চিকিৎসা সম্ভব হয়।

২। সবিরাম পর্যায় (Intermittent, subacute stage)

এই পর্যায়ে রোগীর মাঝে মধ্যে উপসর্গ হয়। এ সকল রোগী অন্ধকারে বা অল্প আলোতে সেলাই, পড়াশোনা, টেলিভিশন দেখতে গিয়ে চোখে ও মাথায় ব্যথা অনুভব করেন। চোখের চাপ এ সকল অবস্থায় বেড়ে যায়। কর্ণিয়ায় পানি জমে এবং আলোর (বাতির) চারিদিকে রংধনুর মতো বিভিন্ন রং দেখতে পারেন।

রংধনু

উজ্জ্বল আলোতে বা ঘুমালে কিংবা এমনিতেই কোন চিকিৎসা ছাড়া ২/১ ঘণ্টার মধ্যে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন। বছরে বা মাসে ২/১ বার বা সপ্তাহে ২/১ বার এ সকল উপসর্গ হতে পারে। অনেকের আরও ঘন ঘন এই উপসর্গ দেখা দিয়ে পরবর্তী অ্যাকুট পর্যায়ে চলে যেতে পারে।

এই পর্যায়ে চোখের চাপ মাপলে সাধারণত ৪৫ মি.মি. মারকারির কম থাকে এবং অপটিক ডিস্কের কাপ স্বাভাবিক থাকে।

চিকিৎসা

ঠিক এই পর্যায়ে রোগী চিকিৎসকের কাছে এলে তার চোখে পাইলোকার্পিন ফোঁটা দিয়ে চাপ কমানো হয় ও পরে দুই চোখেই লেজার পেরিফেরাল আইরোডোটোমি বা LPI করা হয়ে থাকে।

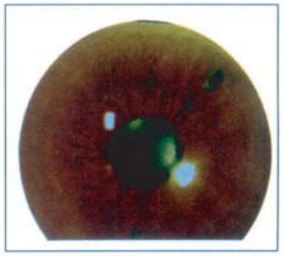

এলপিআই করার পর

কোন রোগী এই পর্যায়ের পরে এসে যদি এই রোগের বিবরণ দেন তাহলে তাকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করতে হবে।

৩। অ্যাকুট কনজেস্টিভ পর্যায় (Acute congestive stage)

অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লকোমার এই পর্যায়ের উপসর্গ অত্যন্ত স্পষ্ট যা রোগী না দেখে, টেলিফোনে শুনেই রোগ নির্ণয় করা সম্ভব। এই পর্যায়ের উপসর্গ হচ্ছে-

১। চোখে হঠাৎ অত্যধিক ব্যথা- সাধারণত এক চোখে ব্যথা হয়। এই ব্যথা পরে আস্তে আস্তে মাথার দিকে যায় এবং দাঁতেও হতে পারে।

২। চোখ লাল হয়ে যায় ও ফুলে ওঠে।

৩। দৃষ্টিশক্তি লোপ পায় এমনকি শুধু আলো ছাড়া কিছুই দেখা যায় না।

৪। অনেকের বমি বমি ভাব কিংবা বমিও হতে পারে।

পরীক্ষা করলে দেখা যায়

১। কর্ণিয়াতে পানি জমে ঘোলা হয়ে যায়।

২। কর্ণিয়ার চারিধারে বেশি লাল বা সিলিয়ারি কনজেশন।

৩। খুবই স্বল্প গভীর সামনের চেম্বার।

৪। পিউপিল খাড়াখাড়িভাবে বড় হয় এবং আলোতে সংকুচিত হয় না।

৫। চোখের চাপ বাড়ার ফলে চোখ শক্ত হয়ে যায় এবং এসময় চোখের চাপ সাধারণত ৫০ থেকে ১০০ মি.মি. মারকারি পর্যন্ত হয়ে যায়।

৬। কর্নিয়াতে গ্লিসারিন দিয়ে-চোখের চাপ কমিয়ে গোনিওস্কপি করলে চোখের কোণ গ্রেড ০ থেকে ১ এর মধ্যে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা

এই পর্যায়টি চোখের একটি জরুরি অবস্থা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উপযুক্ত চিকিৎসা করাতে না পারলে চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

ক) রোগীকে চিৎ করে শোয়াতে হবে, যাতে চোখের লেন্স পেছন দিকে যেতে পারে এবং চোখের কোণ কিছুটা ফাঁকা হতে পারে।

খ) এসিটাজোলামাইড ইনজেকশন বা ৫০০ মি. গ্রাম ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে।

গ) স্টেরয়েড জাতীয় ফোঁটা ওষুধ ৬ ঘণ্টা অন্তর চোখে দিতে হবে।

ঘ) চোখের চাপ কমাবার ওষুধ সাধারণত টিমোলাল - ১২ ঘণ্টা অন্তর দিতে হবে।

ঙ) এক ঘণ্টা পর পাইলোকার্পিন এক ফোঁটা × ৬ ঘণ্টা অন্তর দিতে হবে।

চ) আরও আধা ঘণ্টা পর সম্ভব হলে চোখের চাপ মাপতে হবে।

ছ) এরপরও চোখের চাপ বেশি থাকলে ৫০% গ্লিসারোল খাওয়াতে হবে অথবা ২০% ম্যানিটোল ইনজেকশন দিতে হবে।

এ সময়ে এক ধরনের লেজার Argon Laser Peripheral Irodoplasty (ALPI) করা যেতে পারে, তাতে চোখের কোণ অনেকটা ফাঁকা হতে পারে।

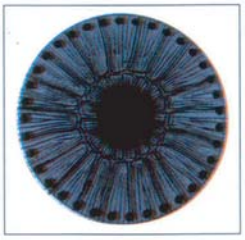

এএলপিআই করার পর

এর পর চোখের চাপ কমে গেলে গোনিওস্কোপি করে দেখতে হবে। শতকরা ৫০ ভাগ বা তার বেশি অ্যাঙ্গেল পেরিফেরাল অ্যান্টেরিয়র সাইনেকিয়া হয়ে বন্ধ থাকলে, আগের স্তরের ন্যায় পেরিফেরাল আইরিডেকটমি করে কোন ফল হবে না। এসব ক্ষেত্রে প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমার মতো ট্রাবিকুলেকটমি অপারেশন করতে হবে।

৪। দীর্ঘস্থায়ী পর্যায় (Chronic Stage)

বার বার সবিরাম বা অ্যাকুট কনজেস্টিভ পর্যায়-এ আক্রান্ত হলে এবং তার সঠিক চিকিৎসা না হলে রোগটি দীর্ঘস্থায়ী পর্যায়ে পৌঁছে। এই অবস্থায় চোখের অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমার ন্যায় কাপ-ডিস্কের অনুপাত বেড়ে যায়, দৃষ্টির পরিসীমা কমে যায় এবং গোনিওস্কোপিতে অনেক বেশি অ্যান্টেরিয়র সাইনেকিয়া দেখা যায়। চোখের চাপ স্বাভাবিকের চাইতে সামান্য বেশি থাকে।

গোনিওস্কোপি না করলে অনেক সময় এই পর্যায় কে প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমা থেকে আলাদা করা কঠিন হয়।

চিকিৎসা

সাধারণত লেজার পেরিফেরাল আইরডোটমি করে এই পর্যায়ে চোখের চাপ কমানো সম্ভব হয় না। সেজন্য শল্য চিকিৎসা ট্রাবিকুলেকটমি অপারেশন করে চিকিৎসা করতে হয়।

৫। চূড়ান্ত পর্যায় (Absolute stage)

এটি অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লকোমার পরিণতি। এই অবস্থায় চোখে কিছু দেখা যায় না, এমনকি আলোও দেখা যায় না। চোখের কর্ণিয়াতে পানি জমে ঘোলা থাকতে পারে। পিউপিল বড় থাকে এবং আলোতে কোন সংকোচন হয় না। আইরিসে পূর্বের অ্যাকুট পর্যায়ে ভোগার ফলে এট্রফি থাকে। সর্বোপরি চোখের চাপ অনেক বেশি থাকে এবং এই কারণে মাঝে মাঝে চোখে ব্যথা হতে পারে।

চিকিৎসা

এই পর্যায়ে চোখের দৃষ্টির কোন চিকিৎসা নেই। শুধু ব্যথা কমাবার জন্য ওষুধ ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের চোখে খুব ব্যথা ও যন্ত্রণা হলে (Painful blind eye) চোখের ভেতরে ইনজেকশন দিয়ে ব্যাথা কমানো যেতে পারে কিংবা উপসর্গ নিরাময়ের শল্য চিকিৎসা করে চোখের চাপ কমানো যেতে পারে।

প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি গ্লকোমা কোনটি বেশি ক্ষতিকর

গ্লকোমা যে ধরনেরই তা হোক চোখের জন্য ক্ষতিকর। তবে সেকেন্ডারি গ্লকোমা কোন চোখের অসুখের কারণে হয় বলে এর উপসর্গ প্রথম থেকেই ধরা পড়ে এবং রোগী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে সঠিক সময়ে চিকিৎসা নেবার সুযোগ পান। প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল বন্ধ ও জন্মগত গ্লকোমাতেও প্রাথমিক পর্যায়ে বেশ কিছু উপসর্গ দেখা দেয় ও রোগীরা চিকিৎসকের কাছে এসে থাকেন। কিন্তু প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমাতে রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে তেমন কোন উপসর্গ থাকে না বলে এসব রোগীরা চিকিৎসকের কাছে আসেন না। তাছাড়া এ রোগেও চোখের ছানি রোগের মতো দৃষ্টিশক্তি আস্তে আস্তে কমে যায় বলে অনেকে এই রোগকে ছানি রোগ ভেবে ছানি পাকার ভ্রান্ত অপেক্ষায় থাকেন, ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে গ্লকোমা নির্ণয় হয় না। পরিণতি হিসেবে এই সমস্ত রোগীরা অন্ধত্ব বা প্রায় অন্ধত্ব নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন যখন চিকিৎসা করার তেমন কিছু থাকে না। কারণ এই রোগে চোখের দৃষ্টিশক্তির যে ক্ষতি হয় তা ব্যাপক চিকিৎসা করলেও ফিরে পাওয়া যায় না। এই বিষয়টি বিবেচনা করলে প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমাকেই বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে এবং এই রোগের একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় প্রয়োজন। আর একবার রোগ নির্ণয় হয়ে গেলে, রোগীকে তার অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বোঝানো গেলে চিকিৎসা তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ হয়।

পানি চা কফি ও গ্লকোমা

সাধারণ মাত্রায় পানি, চা বা কফি খেলে গ্লকোমা হয় না। কিন্তু যদি কারও বংশগত গ্লকোমার প্রবণতা থেকে থাকে তাহলে অতি মাত্রায় পানি, চা বা কফি সেবন তার জন্য ক্ষতিকর। কয়েক মিনিটের মধ্যে ১ লিটার পানি পান করলে চোখের চাপ বেড়ে যেতে পারে। যাদের চোখে গ্লকোমা হবার সম্ভাবনা নেই তাদের ২ থেকে ৭ মি.মি. মারকারি পর্যন্ত এই চাপ বাড়ে। কিন্তু যাদের গ্লকোমা হবার সম্ভাবনা আছে (Glaucoma suspect) তাদের ক্ষেত্রে এই চাপ ৮/১০ মি.মি. মারকারি বা এরও বেশি বেড়ে যেতে পারে ও অপটিক নার্ভের ক্ষতি করতে পারে।

এভাবে এক লিটার পানি পান করিয়ে সম্ভাব্য রোগীদের সত্যিকার অর্থে গ্লকোমা আছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এই পরীক্ষাটির নাম ওয়াটার ড্রিংকিং টেস্ট (Water Drinking Test)

একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে, যাদের বংশগত কারণে গ্লকোমা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তারা একসঙ্গে বেশি মাত্রায় পানি খেলে (যেমন, অনেকে হাইড্রেশন-থেরাপি হিসাবে সকালে ৩/৪ গ্লাস পানি একই সঙ্গে খেয়ে ফেলেন অথবা কিডনি রোগের জন্য অনেকে এক সঙ্গে প্রচুর পানি খান) তাদের চোখের চাপ বেড়ে গ্লকোমা রোগ হতে পারে। তাই তাদের মাঝে মধ্যে গ্লকোমা রোগের জন্য চক্ষু পরীক্ষা করানো উচিত।

অন্ধকার ও গ্লকোমা

অনেকে বেশিক্ষণ অন্ধকারে কাজ করলে বা বসে থাকলে চোখে ব্যথা অনুভব করেন। যেমন সিনেমা হলে অনেকক্ষণ বসে থাকার দরুণ কিংবা ডার্করুমে এক্সরে বিভাগে বেশি সময় ধরে কাজ করলে চোখের চাপ বেড়ে গিয়ে এরকম ব্যথা হতে পারে। কিন্তু সব মানুষের হয় না। একমাত্র যাদের চোখের সামনের চেম্বার স্বল্পগভীর (Shallow anterior chamber) তাদেরই এরকম উপসর্গ দেখা দেয়। এমন কি এদের অনেকের হঠাৎ করে অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লকোমা রোগের উৎপত্তি হয়ে যেতে পারে।

অন্ধকারে বা অল্প আলোতে চোখের পিউপিল আকারে বড় হয় এবং আইরিসের প্রান্ত গিয়ে সামনের চেম্বারের অ্যাঙ্গেলকে সাময়িকভাবে বন্ধ করে অ্যাকুয়াস নির্গমনের পথকে বন্ধ করে দেয় ফলে চোখের চাপ বেড়ে যায় ও চোখে ব্যথা অনুভূত হয়। অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরে এলে পিউপিল ছোট হয়ে আবার অ্যাঙ্গেল খুলে যায় ও উপসর্গ ভালো হয়ে যায়।

এই কারণে যাদের অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লকোমা হতে পারে বলে সন্দেহ করা হয় তাদেরকে ডার্ক রুম টেষ্ট (Dark Room Test) নামক একটি পরীক্ষা করা হয়। রোগীকে অন্ধকার ঘরে উপুড় করে শোয়ানো হয় এবং ১৫ মিনিট পর পর ৫/৬ বার চোখের চাপ মাপা হয়। যদি কারও চাপ প্রথম বারের চাইতে ৮ মি.মি. মারকারি বা এর অধিক বেড়ে যায় তাহলে তার অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লকোমা হতে পারে বলে ধরা হয় এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

বর্তমানে চোখের কোণ পরীক্ষার জন্য গোনিওস্কপি ছাড়াও আরো আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন ইউ বি এম এন্টেরিয়র সেগমেন্ট ওসিটি ব্যবহার করা হয়। এ সকল পরীক্ষায় চোখের কোণের সরাসরি পরিমাপ করা যায়।

পড়াশোনা সেলাই টিভি এবং গ্লকোমা

অল্প আলোতে অনেকক্ষণ ধরে পড়াশোনা, সেলাই করলে বা টেলিভিশন দেখলে ঐ একইভাবে চোখের চাপ বেড়ে গিয়ে অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লকোমার সূত্রপাত হতে পারে। আগেই বলেছি যাদের চোখের সামনের চেম্বার স্বল্প গভীর তাদেরই এরকমটি হতে পারে।

সুতরাং একমাত্র যারা অন্ধকার বা অল্প আলোতে কাজ করার সময় চোখে বা মাথায় ব্যথা অনুভব করেন তারা চক্ষু চিকিৎসককে দেখিয়ে গ্লকোমা আছে কি নেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন।

উপসর্গহীন চোখে গ্লকোমা

আপনার চোখে কোন উপসর্গ নেই তবুও আপনার গ্লকোমা আছে কি?

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ গ্লকোমা রোগটির সঙ্গে খুব বেশি পরিচিত নন। চোখের অন্ধত্বের এটি একটি প্রধান কারণ। কিন্তু তার গ্লকোমা আছে কি নেই, সেটি কিভাবে বুঝবেন? এ প্রশ্ন অনেকেই করে থাকেন। হ্যাঁ, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিশেষ করে প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমাতে রোগীরা প্রাথমিক অবস্থায় কিছু বুঝতে পারেন না। তাদের চোখে কোন ব্যাথা নেই, লাল হয় না, দূরে কিংবা কাছে দেখেনও ভালো। আর এই কারণেই চিকিৎসকদের দায়িত্ব অনেক বেশি। কেননা এই রোগটি সাধারণত চিকিৎসকরাই নির্ণয় করে থাকেন।

এই রোগটি যেহেতু ৩৫ বছরের বেশি বয়সে শুরু হয় এবং খুব ধীরে ধীরে চোখের চাপ বেড়ে চোখের (অপটিক) নার্ভের ক্ষতি করে, সেহেতু ৩৫ বছরের বেশি বয়সের যে কোন রোগীকেই চালশে চশমা দেবার সময় সম্পূর্ণ চোখের পরীক্ষা করা উচিত। বিশেষ করে তার দৃষ্টি, অফথ্যালমোস্কোপ-এর সাহায্যে অপটিক ডিস্ক-এর পরীক্ষা ও চোখের চাপ পরীক্ষা করা প্রয়োজন এবং এসব রিপোর্ট ব্যবস্থাপত্রে বা রোগীর ফাইলে লিখে রাখা উচিত।

যদি কোন রোগীর অপটিক ডিস্কের পরিবর্তন থাকে কিংবা চোখের চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে তাহলে অবশ্যই তার দৃষ্টির পরিসীমার পরীক্ষা করাতে হবে, অপটিক ডিস্কের ছবি তুলে রাখতে হবে (বিশেষ ক্যামেরার সাহায্যে ঐ ছবি তোলা হয়)।

কোন রোগীর গ্লকোমা রয়েছে এমন সন্দেহ করলে তার জন্য আরও বিশেষ দু'একটি পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। এই গ্লকোমা যেহেতু বংশগত, সে কারণে কোন রোগীর গ্লকোমা ধরা পড়লে তার বাবা-মা, নিকটাত্মীয়দেরও চোখে গ্লকোমা আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা উচিত। ডায়াবেটিক রোগী ও অতি মায়োপিক রোগীদের মধ্যে এই গ্লকোমার হার বেশি। সুতরাং এসব রোগীকে ৩৫ বছর বয়স না হলেও গ্লকোমার প্রাথমিক পরীক্ষাসমূহ করানো উচিত।

গ্লকোমা ও চোখের ছানি

চোখের ছানি ও গ্লকোমা উভয় রোগেই চোখের দৃষ্টি ধীরে ধীরে কমতে থাকে। যার ফলে গ্লকোমার কারণে দৃষ্টি কমতে থাকলেও অনেকে চোখের ছানি ভেবে ভুল করে থাকেন। ছানি অনেকের কাছেই পরিচিত একটি চোখের অসুখ। এটা পাকতে (mature হতে) সময় লাগে এবং এর অপারেশন করে (ফ্যাকো সার্জারি/এস আই সি এস) চিকিৎসা করা হয়। অনেকে এক্ষেত্রে গ্লকোমাকে ছানি মনে করে তা পাকার জন্য অপেক্ষা করেন এবং যখন রোগী প্রায় অন্ধ হয়ে যান তখন ছানি পেকে গেছে ভেবে চিকিৎসকের পরামর্শের জন্য আসেন। এই অবস্থায় সত্যি যদি ছানি রোগ হয় তাহলে তার সঠিক চিকিৎসা সম্ভব, কিন্তু রোগী যদি গ্লকোমাতে ভুগে অন্ধ হয়ে যায় তাহলে তার আর চিকিৎসা নেই। অথচ এই রোগী যদি প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসকের কাছে আসতেন তাহলে তাকে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করার পর চিকিৎসা করা যেত ও অন্ধত্ব এড়ানো সম্ভব হতো।

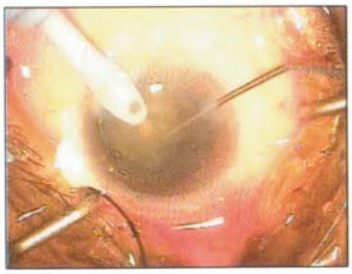

গ্লকোমার সাথে চোখের ছানি থাকলে - কোন জাতীয় গ্লকোমা তার উপর ভিত্তি করে চিকিৎসা করা হয়। যেমন ছানি পড়ার কারণে যদি সেকেন্ডারি গ্লকোমা হয় তাহলে শুধু ছানি অপারেশন করলেই গ্লকোমা ভালো হয়ে যায়।

প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমার সঙ্গে যদি চোখের ছানি থাকে তাহলে রোগীর ছানি এবং গ্লকোমার জন্য ২টি অপারেশনই করতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে চক্ষু বিশেষজ্ঞ সার্জন নির্ধারণ করে থাকেন- ২টি অপারেশন একই সময়ে করবেন নাকি ২টি অপারেশন আলাদা আলাদাভাবে করবেন। দুটি নিয়মেরই কিছু সুবিধা এবং অসুবিধা আছে।

বর্তমানে গ্লকোমা এবং ছানির জন্য কম্বাইন্ড ফ্যাকো সার্জারি ফোল্ডঅ্যাবল কৃত্রিম লেন্স সংযোজন এবং ট্রাবিকুলেকটমি একত্রে করে অনেক বেশি সফলতা পাওয়া যাচ্ছে।

গ্লকোমা রোগীর জন্য ক্ষতিকর ওষুধ

অন্ধকারে যেমন চোখের পিউপিল বড় হয়ে অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লকোমার সূত্রপাত হতে পারে, তেমনি যে সকল ওষুধ পিউপিলকে বড় করে যেমন এট্রপিন চোখের ড্রপ, পেটে ব্যথার জন্য ব্যবহৃত ব্যালাডোনা বা এই জাতীয় ট্যাবলেট ও ওষুধ ঐ ধরনের অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লকোমার সৃষ্টি করতে পারে।

রক্তের চাপ অতিমাত্রায় হ্রাস পেলে অপটিক নার্ভের অক্সিজেন সরবরাহ কমে যায় এবং তাতে নার্ভের ক্ষতি হলে দৃষ্টির পরিসীমা কমে যায়। সুতরাং যেসব ওষুধ রক্তের চাপ খুব কমিয়ে দেয় তা গ্লকোমা রোগীর জন্য ক্ষতিকর।

অনেক রোগীর স্টেরয়েড জাতীয় চোখের ড্রপ, মলম বা ট্যাবলেট ব্যবহার করার ফলে চোখের চাপ বেড়ে যায়। যাদের বংশগত পূর্ব প্রবণতা রয়েছে তাদেরই শুধু এই ওষুধে চোখের চাপ এমনকি রক্তের চাপও বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সাধারণত ২ সপ্তাহের বেশি এই ওষুধ ব্যহার করলেই চাপ বাড়তে পারে এবং অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমার ন্যায় রোগীর অজান্তেই চোখের ক্ষতি হতে থাকে। সুতরাং যেসব রোগীকে অনেকদিন ধরে স্টেরয়েড ড্রপ বা মলম ব্যবহার করতে হবে, তাদেরকে ঘন ঘন পরীক্ষা করে অপটিক ডিস্কের কোন পরিবর্তন হচ্ছে কি না, বা চোখের চাপ বাড়ছে কি না তা দেখতে হবে।

গ্লকোমা রোগী ও সমাজের প্রতি তার কর্তব্য

গ্লকোমা কতটা কঠিন চোখের অসুখ তা আর দশজন মানুষের চেয়ে একজন গ্লকোমা রোগীই ভালো বোঝেন। তাই এই রোগটি বুঝতে না পারা বা অসচেতনতার কারণে কেউ যাতে অপূরণীয় ক্ষতির শিকার না হন, সেজন্য একজন গ্লকোমা রোগী যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারেন। তার চিকিৎসার অভিজ্ঞতা আশপাশের লোকজনকে জানালে তারা সহজেই রোগটি সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন এবং সঠিক সময়ে চিকিৎসা নিতে পারবেন। এর ফলে বহু গ্লকোমা রোগ সঠিক সময়ে নির্ণয় করে উপযুক্ত চিকিৎসা দেওয়াও সম্ভব হবে। পরোক্ষভাবে গ্লকোমার কারণে অন্ধত্ব প্রতিরোধে এটি একটি অন্যতম পদক্ষেপ হতে পারে। গ্লকোমা যেহেতু অনেকক্ষেত্রে বংশগতভাবে বিস্তার লাভ করে, সেজন্য একজন গ্লকোমা রোগীর রক্ত সম্পর্কিত নিকট আত্মীয়-স্বজনের চক্ষু পরীক্ষা করে তাদের মধ্যে গ্লকোমা-প্রবণতা আছে কি নেই দেখা উচিত। এ ব্যাপারেও একজন রোগী যথেষ্ট সহযোগিতা করতে পারেন।

দেশে-বিদেশে গ্লকোমার প্রভাব

গ্লকোমা এখন একটি আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সমস্যা। উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশেই গ্লকোমা অন্ধত্বের একটি প্রধান কারণ। পঁয়ত্রিশোর্ধ মানুষের মধ্যে শতকরা ২ ভাগ মানুষ এই রোগে ভুগে থাকেন। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেকই হলেন প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমা (POAG) রোগী।

বাংলাদেশের উপজাতীয় এবং মেরু অঞ্চলের এস্কিমোদের (Eskimo) মধ্যে অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লকোমার প্রভাব খুব বেশি। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লকোমার প্রভাব বেশি।

সর্বশেষ সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা গেছে, আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে অন্ধত্বের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে গ্লকোমা। আমাদের দেশে ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে এ অবস্থা আরও মারাত্মক। আগেই বলেছি, গ্রামগঞ্জের বহু রোগী চোখে কম দেখলে চোখে পর্দা বা ছানি (Cataract) মনে করেন এবং কবে এই পর্দা পরিপক্ক হবে (Mature cataract) সেই আশায় অপেক্ষা করেন। যখন তিনি একেবারে কম দেখেন তখন হয়তো চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। তার যদি সৌভাগ্যবশত ছানিই হয়ে থাকে তাহলে তার ভালো চিকিৎসা হবে। কিন্তু যদি ছানি না হয়ে গ্লকোমার কারণে তিনি কম দেখেন তাহলে দুর্ভাগ্যবশত ঐ চোখের আর কোন ভালো চিকিৎসা সম্ভব হয় না।

বাংলাদেশ আই কেয়ার সোসাইটি পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে বাংলাদেশে পঁয়ত্রিশোর্ধ পুরুষ/মহিলাদের শতকরা ২.৮০ জন গ্লকোমা রোগে রুগছেন। গ্লকোমা রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্ব গ্লকোমা সোসাইটি - প্রতি বছর বিশ্ব গ্লকোমা দিবস এবং গ্লকোমা সপ্তাহ পালন করে থাকে। বাংলাদেশ গ্লকোমা সোসাইটিও বিশ্ব গ্লকোমা সোসাইটির অধিভুক্ত (affiliated) এবং গ্লকোমা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে।

গ্লকোমা প্রতিরোধ

গ্লকোমা প্রতিরোধের প্রধান শর্ত হলো এ বিষয়ে ব্যাপক জন-সচেতনতা সৃষ্টি এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞ সহ সকল সাধারণ চিকিৎসকের এ রোগ নির্ণয়ের অংশগ্রহণ। আর এ দুটো বিষয়কে সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করার জন্য সমাজের শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তিবর্গ এবং চিকিৎসক সমাজকে সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।

ব্যাপক জন-সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সকল প্রচার মাধ্যমে (সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন) সাধারণ মানুষের জন্য সহজ সাবলীল ভাষায় এবং অবশ্যই মাতৃভাষায় এ রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রচার করা এবং এ কাজে চক্ষু বিশেষজ্ঞদেরই এগিয়ে আসতে হবে।

বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠন গ্রামে-গঞ্জে চক্ষু শিবির করে যখন চোখের ছানি অপারেশন করেন তখন সম্ভাব্য রোগীদের (পঁয়ত্রিশোর্ধ নারী পুরুষ) গ্লকোমা স্ক্রিনিং টেস্ট করা যেতে পারে। এতে সহজে সরাসরি রোগ নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক জনগণের মধ্যে এ রোগটি সম্পর্কে একটা সচেতনতাও সৃষ্টি হবে।

সাধারণ চিকিৎসকদের (জেনারেল প্র্যাকটিশনার্স) জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা যায়। ফলে এ রোগ নির্ণয়ের বিভিন্ন আধুনিক পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলি সম্বন্ধে তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে এ রোগ নির্ণয়ে চিকিৎসকগোষ্ঠীর ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যেতে পারে। যেহেতু আমাদের দেশে চক্ষু বিশেষজ্ঞের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম, তাই সাধারণ চিকিৎসকদের এ বিষয়ে অবশ্যই সম্পৃক্ত করতে হবে।

গ্লকোমা রোগীও এক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারেন। তিনি তার রোগ ও চিকিৎসার অভিজ্ঞতা তার আশেপাশের লোকজনকে জানালে তারা সহজেই রোগটি সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন এবং সঠিক সময়ে চিকিৎসা করিয়ে চোখকে অন্ধত্বের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন। এছাড়া পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের পর বছরে একবার চোখের চাপ নির্ণয়সহ সম্পূর্ণ চক্ষু পরীক্ষা করানো প্রয়োজন। এটা সবাই উপলব্ধি করলে গ্লকোমা রোগটি প্রতিরোধ সহজতর হবে।

অধ্যাপক ডা. এম নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ। তিনি ১৯৮২ সালে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেন এবং পরবর্তীতে চক্ষু বিজ্ঞানে এমসিপিএস, ডিপ্লোমা এবং এফসিপিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৯০ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালে কাজ করেন এবং ১৯৯৫ সাল থেকে বারডেম হাসপাতাল চক্ষু বিভাগে কনসালট্যান্ট হিসাবে কর্মরত আছেন। বর্তমানে তিনি ঐ হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট, গ্লকোমা বিভাগের প্রধান এবং ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক।

ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি লেখালেখির সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি *'চোখ ও চশমা'*, *'ডায়াবেটিস ও চোখ'*, *'চোখের উচ্চচাপ গ্লকোমা'*, *'চোখের সাধারণ সমস্যা-১০০ প্রশ্ন ও উত্তর'* গ্রন্থসমূহের লেখক। ডা. এম নজরুল ইসলাম ৮ বছর যাবৎ বাংলাদেশ চক্ষু চিকিৎসক সমিতি ও বাংলাদেশ একাডেমি অফ অফথ্যালমোলজি জার্নালের সম্পাদক ছিলেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে তার ৫৫টির বেশি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে তিনি বাংলাদেশ চক্ষু চিকিৎসা সমিতির প্রকাশনা সম্পাদক, বৈজ্ঞানিক সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, একাডেমি সম্পাদক, যুগ্ম মহাসচিব ইত্যাদি পদে নির্বাচিত হয়ে কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ গ্লকোমা সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক।

অধ্যাপক এম. নজরুল ইসলাম ১৯৯৭ সালে ব্যাংকক 'মেটাপ্রাচেরাক হাসপাতাল' থেকে ফ্যাকো সার্জারি এবং ২০০৫ সালে আমেরিকার 'নিউইয়র্ক আই অ্যান্ড ইয়ার ইনফারমারি' থেকে গ্লকোমা বিষয়ে ফেলোশিপ করেন।

পড়াশুনা, আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ ও ভ্রমণকারী হিসেবে আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ তিনি সফর করেছেন। অধ্যাপক ডা. এম. নজরুল ইসলাম বাংলা একাডেমীসহ দেশ-বিদেশের অনেক চিকিৎসা সংগঠনের জীবন সদস্য।

Glaucomar Shathe Bashobash
(Living with Glaucoma)
by Prof. Dr. M. Nazrul Islam

Price : BDT. 200.00 only / US $ 10.00

ISBN 984-70022-0184-1

Published by Saeed Bari
Chief Executive, Sucheepatra
38/2Ka, Banglabazar, Dhaka 1100
Bangladesh
e-mail: sucheepatra77@gmail.com
saeedbari07@gmail.com
Web: www.sucheepatra.com